মুক্তিযুদ্ধের মিশন আমার জীবন ■ ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

মুক্তিযুদ্ধের মিশন আমার জীবন

ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

তখন যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধ চলছিল বাংলাদেশের মুক্তি তথা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষে। এই যুদ্ধের একটি ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশের বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে। অপর অংশটি প্রসারিত হয়েছিল সমগ্র বিশ্বের দেশে দেশে– নানামুখী কূটনৈতিক প্রয়াসের উদ্যোগ আয়োজনে। চেষ্টা চলেছিল বৈরী শক্তিসমূহকে বাংলাদেশের পাশে দাঁড় করানোর, বাংলাদেশের মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার এবং ঘুমন্ত বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করার।

এই কূটনৈতিক তৎপরতার অংশভাক হয়ে ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী এবং সাংসদ মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের মিশন নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবানন ও সিরিয়ায়। প্রথমে পৌঁছেছিলেন বৈরুতে। তারপর দামেসক এবং আজকের রক্তঝরা আলেপপোতে। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দফতর এবং মধ্যপ্রাচ্যের দূতাবাসগুলো যুগিয়েছিল আন্তরিক সাহায্য এবং সহযোগিতা।

এই মিশনে বেরিয়ে গ্রন্থকারকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার। চট্টগ্রাম থেকে তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর যাত্রা এবং বহু শহর জনপদ রাজধানী ও দেশ পাড়ি দিয়ে আবার চট্টগ্রামে ফিরে বিরতি টেনেছিলেন সেই যাত্রার। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই যাত্রা জয়যাত্রা হয়ে ওঠেনি। তবে সাফল্যও কিছু কম জোটেনি। ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে মধ্যপ্রাচ্য তখন মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশের দিক থেকে। ইসলামের ধ্বজাধারী পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অটুট ঐক্যের প্রতিই ছিল তাদের মানসিক সমর্থন। তাই বাংলাদেশের মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তারা ছিলেন স্পষ্টতই বিরূপ। তাদের হৃদয়ের কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছেল আমাদের জন্য।

সেই বন্ধ দুয়ার মুক্ত এবং বিরূপতাকে প্রসন্ন করে তোলার জন্য সেদিন মোল্লা জালাল এবং ড. কোরেশীকে চালিয়ে যেতে হয়েছিল সাধনা এবং লড়াই। নিয়োজিত করতে হয়েছিল নিজেদের মেধা মনন মনোবল ধৈর্য সাহস এবং বিপক্ষকে বশীভূত করার মতো ব্যক্তিত্ব ও বাকচাতুর্যের ক্ষমতাকে।

ইতিমধ্যেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বয়স বেড়েছে অনেক। কিন্তু পুরনো হয়ে যায়নি যুদ্ধদিনের সেইসব অবিস্মরণীয় গল্প গাথা আর উদ্যোগ আয়োজনের কথা। সেই চিরনতুন এবং চিরউজ্জ্বল আয়োজনেরই একটা সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের উপর আলো ফেলা হয়েছে এই গ্রন্থে– যে আলো আমাদের পাঠক-সত্তাকেও আলোকিত করে তুলবে–নিঃসন্দেহে।

মুক্তিযুদ্ধের মিশন :
আমার জীবন

"Les événements mourissent

et voilá les révolutions."

Montesquieu

(পাকাপোক্ত হল ঘটনাসমূহ আর

এই তো স্ফূরণ ঘটল বিপ্লবের।

মোঁতেসকিয়ু)।

"Quand on parle de soi,

On a beau faire, on dit

Jamais toute la vérité."

Roger Martin du Gard

(কেউ যখন নিজের কথা বলে,

ভালোই করে,তবে পুরো সত্যটা কখনো বলেনা।

রজে মার্তাঁ দ্যুগার।)

'আমাদের জীবনে মুক্তিযুদ্ধ একটি বিরাট ঘটনা। এই ঘটনার গভীরতা, ব্যাপকতা এবং সর্বগ্রাসী আচ্ছন্নতা বিশ্লেষণ করে বোঝানো কঠিন। একটি সমগ্র জাতি একাগ্র হয়েছিল একটি পরিবর্তনের জন্য এবং এ পরিবর্তন এসেছিল ভয়ংকর সংঘর্ষের মাধ্যমে। সাহিত্যের জন্য এটা একটি মহার্ঘ চৈতন্য। ...'

সৈয়দ আলী আহসান, *যখন সময় এল*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৩০

মুক্তিযুদ্ধের মিশন : আমার জীবন

ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

সুচয়নী পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৭
স্বত্ব : লেখক

Muktijuddher Mission : Amar Jibon
(Mission of the Freedom Struggle : My life by
Dr. Mahmud Shah Qureshi)

প্রকাশক • মো. ফজলুল হক, সুচয়নী পাবলিশার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মুঠোফোন : ০১৭১২৯৩৯০৬২
প্রচ্ছদ • বদরুল আলম ইমন • **অক্ষর বিন্যাস** : নার্গিস আক্তার
মুদ্রণ • একাল মুদ্রণ
প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০
মূল্য : ২৫০.০০ টাকা
আমেরিকায় পরিবেশক
মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক
সঙ্গিতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
ISBN : 984-90078-152-1
ঘরে বসে সুচয়নী পাবলিশার্স-এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/shuchayani
অনলাইনে অর্ডার করতে– www.rokomari.com
e-mail : shuchayanibd@gmail.com

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধের মিশনে উৎসাহদাতা ও সহযাত্রী
প্রেমবতী পত্নী সৈয়দা কমর জাবীন (নাসরীন),
আমাদের তিন সন্তান
নাবিল শাহ (পূষন)
নূসরাত কমর (প্রসন্না)
শাজেল শাহ (পাপ্পু)
এবং
তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য
দেশপ্রেম ও আত্ম-উপলব্ধির কিছু বীজ
রেখে গেলাম–

শুরুর আগে কিছু কথা

এই বইয়ের নাম দেওয়া যেতো, '১৯৭১-এর ডায়েরি'। কিন্তু এতে আমার পূর্ব জীবনের এবং পরবর্তী কালের কিছু কাহিনী অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে তাই নামটিও বদলে গেছে।

'মিশন' কথাটা ব্যাপকার্থে এখানে বা অন্যত্র ব্যবহৃত। ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তবুদ্ধির উন্মেষ সেই কিশোর কালে, চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকে। উদারনৈতিক চেতনায় সংগ্রামী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছি ১৯৪৮-১৯৫৫ কালপর্বে। এরপর শুধু পড়াশুনা আর পড়ানো। ঘটনাচক্রে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান, মধ্যপ্রাচ্য মিশনে গমন, মিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস–যেমন কলকাতা, দিল্লী, লন্ডন ও প্যারিসে রয়েছে বা হবে। সেভাবেই বিবৃত *মুক্তিযুদ্ধের মিশন : আমার জীবন।*

মুক্তিযুদ্ধের মিশনের মূল দিনপঞ্জি ২৭.৭.১৯৭১ থেকে কোলকাতা ফিরে আসা অবধি। এখানে কিছু বর্জিত হয়নি। সামান্য মার্জিত হয়েছে। কখনোবা সংযোজিত হয়েছে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে। বাকি অংশ পরবর্তী বা সাম্প্রতিক কালের রচনা।

১৯৭১-এর ডায়েরিটি এক সময়ে জাতীয় যাদুঘর বা মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে দিয়ে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে পাঠক এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবেন। বিগত ৪৫ বৎসরে আমার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অন্যান্য রচনা পাঠান্তে কিংবা তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনে এই বিষয়টি নিয়ে কেউ যোগাযোগ করেননি।

দুটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে 'সংগ্রহ' চাওয়া হয়েছিল শুধু। কী দিয়েছি, এখন আর স্মরণ নেই। ভবিষ্যতে বাংলা-নবীশ লেবানন- সিরিয়ার কোনো আরব, দেশী ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক ভাষ্যকার বা সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী হয়তো এই বই ব্যবহার করবেন। সেজন্য প্রমাণপঞ্জিসহ এর একটি পূর্ণরূপ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।

মুক্তিযুদ্ধের মিশন : আমার জীবন–৮

আমার দুষ্পাঠ্য পাণ্ডুলিপি থেকে বইটির কম্পিউটার কম্পোজে কল্যাণীয়া নার্গিস আক্তার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। প্রকাশককেও অগ্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই। যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্নেহভাজন ড. সরদার আবদুস সাত্তারের সেতুবন্ধনের কথাটিও স্মরণীয়।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী
ঢাকা : কলাবাগান
সাভার : নলাম
e-mail : amic.bangladesh@yahoo.com

সূচিপত্র

প্রস্তুতি পর্ব : চট্টগ্রাম শহর, দেব পাহাড় / ১১
যুদ্ধ শুরু : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, কুণ্ডেশ্বরী
রাঙ্গুনীয়া ও রামগড় : মার্চ, ১৯৭১ / ১৭

ভারত/মুজিবনগর অধ্যায়
আগরতলা ও নরসিংগড় পর্ব / ২২
কোলকাতা পর্ব / ২৭
দিল্লী পর্ব / ৩৮

মধ্যপ্রাচ্যে মুক্তিযুদ্ধের মিশন
লেবানন/বৈরুত প্রথম পর্ব / ৪৫
সিরিয়া/দামেশ্‌ক পর্ব / ৫৭
আলেপ্‌পো পর্ব / ৬২
দামেশ্‌ক ফেরা / ৬৫
লেবানন/বৈরুত : দ্বিতীয় পর্ব / ৬৬

ভারত/মুজিবনগর : শেষ অধ্যায়
দিল্লী প্রত্যাবর্তন / ৯১
কোলকাতা আবার : আসল যুদ্ধ এবার / ৯২

স্বাধীন স্বদেশ
ঢাকা : স্বচ্ছ ও সুন্দর / ১০১
চট্টগ্রাম : নতুন পথে / ১০৪

উপসংহার : পথের শেষ কোথায় / ১০৯

❖ নির্ঘণ্ট / ১১২

প্রস্তুতিপর্ব : চট্টগ্রাম

মার্চ, ১৯৭১

মাসটির একেবারে শুরুতেই উপমহাদেশে মারাত্মক ঘটনাবলী ঘটতে থাকে, শেষ হতে হতে রক্তে ভেসে যায় পূর্ব বাংলার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও নদনদী। তাই 'রক্তঝরা মার্চ' 'উত্তাল মার্চ' নামে পরিচিত ১৯৭১-এর যে-মার্চ মাস, আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হবার পরও এখনও সবকিছু যেন চোখের সামনে ভাসছে। মুক্তি-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের আনন্দ, সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ যাকে বলে তা যে সেদিন অনুভূত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তাল তরঙ্গ বইছে চট্টগ্রামে— শুধু সমুদ্রে নয়, স্থল ভাগেও।

কিন্তু কী ভাবে কী হল, কিসের পর কী ঘটল—তা আজ সঠিক বলা কি সম্ভব? দলিলপত্র, চিঠি-পোস্টার, দিনলিপি বেশ কিছু ছিল, কিন্তু অনেকগুলোই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে অন্যদের, যেমন– ড. এ.আর মল্লিক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ড. আনিসুজ্জামান প্রমুখের লেখা।[১] হাতের কাছে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফরের একটি প্রবন্ধ যা *ইত্তেফাক* ২৬ মার্চ ১৯৯২-তে প্রকাশিত। তবে সে সময় তিনি আমার সহকর্মী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশ্য আমি লিখবো আমার অভিজ্ঞতার কথা, স্মৃতি যতটুকু সাক্ষ্য দেয়, প্রয়োজনে হয়তো মিলিয়ে দেখবো অন্যদের লেখার সঙ্গে কিংবা গ্রহণ করবো কিছু উদ্ধৃতি।

প্রথম কথা হচ্ছে, মার্চের ঘটনারাজির পূর্বসূত্ররূপে ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সবার মন-মানসিকতায় কিছুটা উত্তেজনা জমা হতে শুরু করে। সে মাসের ১০ তারিখ আমি এমন একটা কথা শুনি যা অন্য যাঁদের আমি কথাটা শুনিয়েছি, তাঁরা কেউ সঠিক অর্থে তখন তা গ্রহণ করেন নি। ঐ তারিখে ইসলামাবাদ থেকে

---

১ ড. এ.আর মল্লিক, ``Battle of Chittagong and after'', *Daily People's View*, Chittagong, 21.02.1972
সৈয়দ আলী আহসান, *যখন সময় এল*, ঢাকা–নওরোজ, ১৯৯২
ড. আনিসুজ্জামান , *আমার একাত্তর*, ঢাকা–সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭

আগত ফরাশি রাষ্ট্রদূত[২] ঢাকায় আমাকে এ কথা-সেকথার পর জানান-'সামথিং টেরিবল ইজ কামিং এহেড'-ফরাশির অবিকল ইংরেজি অনুবাদে কথাটা বললাম-বাংলাতে ঠিক অর্থ প্রকাশ করবে কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে না পেরে, অর্থাৎ-'ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে সামনে'। তাকি ২৫ শে মার্চ রাত্রে যা ঘটেছে, তাই? না, তখন তো তা' অনুমান করা যায়নি! কিংবা সেরকম চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না কারু পক্ষে।

যাহোক, আমরা মার্চের গোড়ার ঘটনায় চলে আসি। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মাস পয়লা বেতার-ভাষণে আসন্ন জাতীয় সংসদের বৈঠক স্থগিত করে দিলেন। স্বাভাবিকভাবে এতে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু হলো আমাদের অঞ্চলে।

বলেছি, তখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। সেদিন বাংলা বিভাগের এম.এ. শেষ পর্বের মৌখিক পরীক্ষা চলছিলো। তাতে বহিরাগত পরীক্ষকরূপে এসেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ-প্রধান ড.মযহারুল ইসলাম। ১৯৫৪ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে শিক্ষকরূপে পেয়েছিলাম এবং মৃত্যুকাল অবধি তাঁর অশেষ স্নেহভাজন ছিলাম। এদিকে প্রবল উত্তেজনার কারণে পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হলো। চট্টগ্রামে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের বাসায় সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল।

আমাকেও যেতে হল। কথা হল, আমি ড. ইসলামকে শহরে আমার বাসায় নিয়ে যাব এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর ঢাকা যাবার ব্যবস্থা করে দেব।

শেষ বিকেলে ক্যাম্পাসে একটি প্রতিবাদ সভা হল। তাতে মযহারুল ইসলাম সাহেবও অংশগ্রহণ করলেন। তাঁর বক্তৃতায় বোঝা গেল, তিনি রাজশাহীতে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমার গাড়িতে রওনা দিলাম শহরের উদ্দেশ্যে। স্যার আমাকে বোঝালেন, ঢাকায় পৌঁছে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। কিছু গোপনীয় ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ আছে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার জন্য তাঁর কিছু দায়- দায়িত্ব আছে। তখন পর্যন্ত আমি ছিলাম খুবই রাজনীতিবিমুখ। তবে সেদিন থেকে আমার মন-মানসিকতায় রাজনীতি ঢুকে গেল, দেশের অগুনতি

[২] ফ্রান্সের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক অস্ত্রক্রয়ের একটা চুক্তি হতে যাচ্ছে , এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত কাণ্ডাইতে তাঁর বড়ুয়া বাবুর্চির বাড়ি যাবেন, ঢাকায় বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু এবং কাগমারিতে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন-এইসব খুচরো অজুহাত দেখিয়ে এসেছিলেন এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিমাপ করতে। কথা প্রসঙ্গে অনেকটা যেন মুখ ফসকে উক্ত বক্তব্য আমার কাছে বলে ফেলেছিলেন।

সাধারণ মানুষের মতো। পাকিস্তানের অস্তিত্বে আমরা কেউ যেন আর আস্থা স্থাপন করতে পারছিলাম না। পুরো পরিস্থিতি পশ্চিমাংশের নেতা ভুট্টো ও সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্ররূপে প্রতিভাত হল। জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার ব্যাপারটি তার সর্বশেষ আয়োজন।

সরকারের জন্য পূর্বাংশের পুরো এলাকা জুড়ে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলল দেশ।

১৭ মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, 'পূর্ব বাংলা এখন স্বাধীন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। তিনি বলেন, আমার ৮৯ বছরের জীবনে অতীতের সব ক'টি আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। কিন্তু একটি সার্বজনীন দাবিতে জনগণের মধ্যে বর্তমান সময়ের মতো একতা ও সহযোগিতা আমি এর আগে কখনো দেখিনি।[৩]

সহকর্মী মোহম্মদ আবু জাফরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় :

'একাত্তর সালের মার্চে চট্টগ্রাম স্বাধীন ছিল প্রথম থেকেই চট্টগ্রামবাসীরা একধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছিলেন... চট্টগ্রামে সবাই এক প্রকার ধরে নিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে একহাত লড়া ছাড়া বিকল্প নেই। জনসাধারণ প্রথম থেকেই সেই মানসিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল।[৪]

দেব পাহাড়

জাফর তাঁর ভাইদের নিয়ে ছাত্র-জনতার অনেক বেশি কাছাকাছি ছিলেন। আমি দেব পাহাড়ের সামান্য উচ্চতায় অবস্থান করে নতুন সংসার গোছানোর জটিল প্রয়াসে ব্যস্ত। আপাতত দুশ্চিন্তা মযহার স্যারকে কী করে ঢাকায় পাঠাই। সে রাত্রে আর কোন ব্যবস্থা নেই। এদিকে দেশ জুড়ে চলছে লাগাতার হরতাল। পরদিন সকাল বেলা স্যারকে নিয়ে নিজের গাড়িতেই বের হয়ে গেলাম ডা. আবু জাফরের চেম্বারে। জামাল খান এলাকায় অবস্থিত তাঁর চক্ষু চিকিৎসার ক্লিনিক বেশ কাছেই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি দেখে মামা জাফর ও অন্যান্যরা একটু বিস্মিত হলেন। দু'বছরের কিছু বেশি সময় আগেই ইউরোপ ফেরত হলেও আমার যে বিদেশী খাসলত যায়নি–এটাই তাঁদের বিস্ময়ের কারণ। যা হোক, খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, রেয়াজউদ্দিন বাজারের সফিনা হোটেল থেকে কয়েক জন ব্যবসায়ী রাত

[৩] উদ্ধৃত, *দৈনিক কালেরকণ্ঠ*, ঢাকা ১৭ মার্চ ২০১৩।

[৪] মার্চ একাত্তর : দিনলিপি–শ্রুতিলিপি', স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ মার্চ, ১৯৯২, পৃ.১,৩,৬।

এগারোটার দিকে একটা ভাড়া মাইক্রোবাস নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সেখানে গিয়ে কথাবার্তা ঠিক হল। স্যারকে নিয়ে যেতে ওঁরা রাজী হলেন। বাসায় ফিরে রাত্রের আহার সম্পন্ন করে রাত দশটার দিকে স্যারকে গাড়ীতে তুলে দিতে রওনা দিলাম। সবাই তখন অপেক্ষমাণ। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য মহা উৎকণ্ঠায় কাটলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতারে প্রচারিত হলো না সে রাতে। হলো পরদিন সকালে। সেই প্রত্যয়-দীপ্ত ভাষণ শুনে সবাই উত্তেজিত ও প্রফুল্ল।

অবশ্য আমরা অনেকেই তখন মোহমুক্ত : পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই। ওরা বেইমান, বেইনসাফ! যাহোক, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ আদেশ না পেলে আমরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলাম। এম. আর. সিদ্দিকী সাহেব ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে শেখ সাহেবের প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠিত। আমার বড় মামা ডা. আবুল কাসেম আওয়ামী লীগের এম.পি। কিন্তু তাঁকেও ফোনে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ডা জাফর মামাকে। তিনি ৭ মার্চের ভাষণ শুনে ঢাকা থেকে ফিরেছেন। তিনি (জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ) বললেন, ধৈর্য ধরুন! কিন্তু বেশি ধৈর্য ধরা গেল না।

৮ মার্চ সমমনা বন্ধুরা অধ্যাপক আবুল ফজলের বাসায় মিলিত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও চট্টগ্রাম কলেজের কয়েকজন শিক্ষক একত্র হয়েছিলেন। তাছাড়া স্থানীয় সংস্কৃতি কর্মীও ছিলেন। 'শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী প্রতিরোধ সংঘ' গঠিত হল। বিভিন্ন লেখায় সেই কমিটির সদস্যদের নাম রয়েছে। তবে আমার কিছু সংশয় আছে। মূল কাগজপত্র ছিল আমার কাছে। কিন্তু একাত্তরের এপ্রিলেই, মুজিবনগর চলে গেলে আমার প্রতিবেশিরা নিজেদের আত্মরক্ষার খাতিরে সেগুলো নষ্ট করে দিয়েছিলেন। যাহোক, আমাকে কেন জানি, সংঘের সমন্বয়ক (কো-অর্ডিনেটর)' করা হয়েছিল।[৫]

আসলে তিনটি কমিটি খুব কার্যকর ছিল, একটি নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কমিটি যার-মূল পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ ও ডা. কামাল খান, তারপর প্রচার কমিটি যার দায়িত্বে ছিলেন সহকর্মী মোহাম্মদ আবু জাফর আর ছিল অর্থকমিটি যাতে ছিলাম সৈয়দ মুহম্মদ শফি (আর্ট প্রেস), তাহের সোবহান,

[৫] আমি এখানে মাহবুব হাসানের বইয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। 'বাংলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক একটি সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তোলার উপযোগী এলবাম তৈরির পরিকল্পনা চলছিল। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল দ্রুত একটি ভূমিকা লিখে দিতে। স্বাক্ষরবিহীন আমার সে প্রকাশিত লেখাটি এখানে ও অন্যত্র উদ্বৃত।

রোকসানা আহমেদ (সংগীতশিল্পী) ও আমি। আমাদের কাজ ছিলো বড় বড় পার্টি থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে প্রথম দুটি কমিটিকে দেওয়া। প্রথমে চাঁদা নিতে যাই এম.আর.সিদ্দিকী সাহেবের কাছ থেকে। উদ্দেশ্য হল, অন্যরা জানুক যে, আমাদের সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ মহল সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। পরবর্তী কয়েকজনের মধ্যে অগ্রণী চাঁদা দাতা হলেন কর্ণফুলী কাগজকলের অবাঙালি মালিক। আমাদের বন্ধুবান্ধব সবাই আন্তরিকভাবে কাজে কর্মে লেগে থাকেন। সন্ধ্যায় একত্র হই শিল্পী রশীদ চৌধুরীর বাসায়। সেখানে তাঁর সহকর্মী দেবদাস চক্রবর্তী, মিজানুর রহিম ও ছাত্র খালেদ, আনসার, তাজুল প্রমুখ পোস্টার ও বিপ্লবী চিত্রাংকনে ব্যস্ত।

মার্চ ১২ অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেবের বাসায় সদস্যবৃন্দ এবং নতুন যোগদানকারী বন্ধুদের নিয়ে আবার সভা হল এবং ১৫ তারিখ অপরাহ্নে লালদিঘী ময়দানে একটা বড় আকারের জনসভার পরিকল্পনা করা হল।

এ ক'দিন মিছিল, খণ্ড খণ্ড জনসমাবেশ, সঙ্গীতানুষ্ঠান, পথনাট্য ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস চলছিল। বোঝা গেল, এ কাজে আমরা সাফল্য অর্জন করে চলেছি। আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে , ফনী বড়ুয়া ও রাই গোপালের কবিগান—প্রথমজন পাকিস্তানের পক্ষে, দ্বিতীয় জন স্বাধীন বাংলার পক্ষে। এক অতি মনোজ্ঞ বিতর্ক বটে!

এর মধ্যে ৩ নং নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির বিশ্ববিদ্যালয় অতিথিশালায় শিক্ষকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা সবাই বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে চলার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখার অঙ্গীকার করেন। উত্তেজনাময় এই পরিস্থিতিতে ১৪ মার্চ কয়েকজন কর্মীসহ আমরা আবার আবুল ফজল সাহেবের বাসায় একত্র হই। বৃহত্তর জন-সমাবেশের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ১৫ মার্চ লালদিঘীর ময়দানে শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘের উদ্যোগে, সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা চলে। ১৫ তারিখ অনেকের অনেক বক্তৃতার মধ্যে সভা মাত করা বক্তৃতা ছিল অধ্যাপক মমতাজউদ্দীনের। তাছাড়া তাঁর একটি একাংকিকাও অভিনীত হয় যাতে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষিত। এতে টিক্কা খানকে প্রধান বিচারপতি শপথ গ্রহণে রাজী না হওয়ার বিষয়টি কৌশলে উত্থাপিত। অনবদ্য অভিনয় ছিল মাহবুব হাসানের। এরপর বন্দরে ও অন্যান্য শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় পথ- নাটক, কবিগান ও সংগীতানুষ্ঠান হতে থাকল ক'দিন ধরে।

অন্যদিকে শহর থেকে ১২/১৪ মাইল দূরে ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারিক মামা শামসুল আলমের বাসভবনে আওয়ামী লীগের ডা. জাফর, আতাউর রহমান খান কায়সার ও ইপি-আর ক্যাপ্টেন রফিক, সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরী প্রমুখ ১৭ মার্চ থেকে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রতিরোধের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। এ পর্যায়ে ডা. জাফরের পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রীডার ড.মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ ও বিজ্ঞান রসায়ন কেন্দ্রের ড. হুমায়ন আব্দুল হাই প্লাস্টিক ও পেট্রোল বোমা তৈরি শুরু করে ছিলেন। পরে এক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে ড. আহমেদ পাক মিলিটারি বাহিনীর হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান।

শহরে আমাদের কার্যক্রম সফল হলে আমরা বিভিন্ন দল গঠন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বাইরে গ্রামে পাঠিয়ে দিতে শুরু করি। এখানে একটি গানের দলের চারজন শিল্পীর নাম উল্লেখ করছি– প্রণোদিৎ কুমার বড়ুয়া, হরি প্রসন্ন পাল, তেজেন সেন ও শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব। তাছাড়া বেশ কিছু মহিলা শিল্পী ছিলেন–রাজিয়া শহীদ, শেফালি ঘোষ, আমাদের ছাত্রী কল্যানী ঘোষ প্রমূখ।

২২ মার্চ অপরাহ্নে নাটক ও সংগীতের একটি বড় দল নিয়ে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত রাঙ্গুনীয়া কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। কাপ্তাই মহাসড়কের কাছে বেশ রাত অবধি চলে বিশাল জনসমাবেশপূর্ণ এই অনুষ্ঠান। কলেজ থেকে আধ মাইল পূর্বে অবস্থিত আমাদের গ্রামের বাড়ীতে সে রাতে আমার স্ত্রী ও আমি থেকে যাই। এবং পরদিন মায়ের দাবিতে সেখানে বিশ্রাম নেই। এক ধরনের ভাবনা চিন্তায় আমি অভিভূত ছিলাম—হয়তো এবার গ্রাম থেকে যাবার পর আর কখনো সেখানে ফিরতে পারবো না।

২৪ মার্চ শহরে ফিরে এলে জানতে পারি চট্টগ্রাম কলেজ সংলগ্ন প্যারেড ময়দানে আমাদের আরেকটি জনসভা হতে চলেছে। আমার ভায়রা প্রকৌশলী মাসুদ মিয়া ঢাকা থেকে এসেছেন সপরিবারে। আছেন ক্যাম্পাসে। তিনি আমার বাসায় এসে জানালেন, আমাদের শ্বশুর সৈয়দ আলী আহসান তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সভা শেষে আমার বাসায় আসবেন চা-পানের জন্য। ইতিমধ্যে বন্দরে পাকিস্তানী সৈন্য ও অস্ত্রবাহী জাহাজ খালাস করা নিয়ে তুমুল খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়েছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড তৈরি হতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দল উপাচার্য ড.এ.আর. মল্লিকসহ আমাদের বাসায় চা-পান শেষে ক্যান্টনমেন্ট এড়িয়ে কাপ্তাইয়ের পথে গ্রামের ভেতর

দিয়ে ক্যাম্পাসে চলে যান অনেক ঘুরে, বেশ রাত্রে। শিল্পী রশীদ চৌধুরীর ও আমার গাড়ি তাঁদের অনুসরণ করে।

২৫ মার্চ আমার স্ত্রীর এবং ২৬ মার্চ ছিল আমার শ্বশুরের জন্মদিন। তাই পরদিন দুটি জন্মদিন একত্রে উদযাপনের দাওয়াত ছিল শাশুড়ীর পক্ষ থেকে। তবে তখনো আমরা ভাবতে পারিনি যে, আমাদের আর শহরের বাসায় ফেরা হবে না।[৬]

যুদ্ধ শুরু : বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

২৫ মার্চ ফোনে শহরের পরিস্থিতি জানার চেষ্টা অব্যাহত থাকল। সেবার মার্চের পুরো মাসটাই ছিল রক্তাপ্লুত। প্রতিদিনই কমবেশি মানুষ খুন হচ্ছে সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর অবাঙালিদের হাতে। প্রতিক্রিয়া হয়েছে বাঙালিদের পক্ষ থেকেও। কিন্তু তা ছিল নিতান্ত সীমিত পর্যায়ে। ইতোমধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাও শোনা হয়েছে সবার। সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটি থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটা দল আসছেন, তাঁরা ক্যাম্পাসে থাকবেন। আমরা ছাত্রদের হলে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবো এবং তাঁরা অদূরে অবস্থিত সেনানিবাস ঘিরে আমাদের ক্যাম্পাস পাহারা দেবেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরা চাল, ডাল, গরু, খাসি ও নানা আহার্যবস্তু নিয়ে ছুটে এল।

এক অবিশ্বাস্য, অবিস্মরণীয় কর্মকাণ্ড শুরু হল। সবাই এক-এক কাজে লেগে পড়ল। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল সিগন্যালের। আসলে আংশিকভাবে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনার। পুরোরাতের জন্য। কিন্তু একরাত পরই আমাদের সর্বাধিনায়ক ড. এ.আর মল্লিক আমাকে ফোনে ডেকে বললেন, ঘরে ফিরে যেতে এবং পরদিন সকাল ৯ টায় তাঁর অফিসে দেখা করতে। সেখানে যাবার পর নির্দেশ পেলাম, তাঁর বড় জামাতা ড. জিয়াউদ্দিন ও বড় ছেলে ফিরু ভাইকে নিয়ে উপাচার্যের মার্সেডিজ গাড়িতে আমাকে যেতে হবে মাইজ ভান্ডারে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার যেন সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, তাই তার সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলো দেখে আসতে হবে।

---

[৬] বাসার কাজের ছেলে আব্দুলকে পাঁচ টাকা দিয়ে আমার স্ত্রী ২৬ তারিখের জন্য বাজার করে রাখতে বলে এসেছিলেন। সে বেশ কিছু-কাল আমাদের বাড়ি আগলে রেখেছিল। পরে বাবা এসে অল্প অল্প করে দামী কাপড়-চোপড় ও অলংকারপত্র গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে থাকলেন অসম্ভব কষ্টকর এবং বিপদজনক বাস-জার্নিতে। খুবই বিশ্বস্ত ও কর্মঠ আব্দুল জলিলকে পরে আমি স্যার এফ রহমান হলের প্রভোস্ট থাকাকালে অর্ডারলি পিয়ন নিযুক্ত করি। বহু পরে জেনেছি, কুমিল্লার বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাবার পথে বাসে আগুন লাগলে সে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

কুণ্ডেশ্বরী

ফিরে এসে দেখি, সিদ্ধান্ত হয়েছে আপাতত সবাই কুণ্ডেশ্বরী বালিকা মহাবিদ্যালয়ে যাবেন। সেটি রাঙ্গামাটি সড়কের সন্নিকট, ক্যাম্পাসেরও কাছে, তাছাড়া অন্যান্য সুবিধা রয়েছে– বিশেষ করে রয়েছে নূতন সিংহ পরিবারের অবিস্মরণীয় ঔদার্য ও আন্তরিকতা।

রাঙ্গুনীয়া

দু-তিনদিন রাউজানের কুণ্ডেশ্বরীতে অবস্থানের পর মনে হল, কর্মহীন ওখানে থাকার চাইতে গ্রামের ভেতর দিয়ে আমাদের এলাকায় চলে যাওয়াই আমার জন্য উত্তম। সেখানে কয়েকটি পরিবারের থাকার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। আমার গাড়িটি হঠাৎ অচল হয়ে পড়াতে শ্যালক মেহরাবের গাড়িতে আমরা রাঙ্গুনিয়া রওনা দিলাম। সঙ্গে আব্বু ও নাসরীন। প্রথমে গেলাম রাঙ্গুনীয়া কলেজে। অধ্যক্ষ সন্তোষ বাবু বললেন, মহাসড়কের এত কাছে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের আত্মগোপন করে থাকা সঙ্গত হবে না। আমার কথা ভিন্ন। আমি এলাকার ছেলে। তাছাড়া আমি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কিছু কাজও করতে পারি এবং তাই করলাম। ছোট মামা বজল ও অন্যান্যদের সাথে কালুরঘাটে যুদ্ধরত আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার পাঠানো এবং অন্যান্য কিছু কাজে তৎপর থাকলাম।

হঠাৎ ৮ এপ্রিল দেখা গেল, আলী আহসান সাহেব গাড়িতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কুণ্ডেশ্বরী থেকে আমাদের বাড়িতে এলেন। বড় জামাই ও তাঁর পরিবারকে রেখে যাবেন এবং একজন ড্রাইভারসহ আমাকে নিয়ে যাবেন। ড্রাইভার কুন্ডেশ্বরী থেকে আমার সাময়িকভাবে অচল গাড়ি এবং একজন কে নিয়ে আসবেন আর আমি রাত্রে সেখানে থেকে পরদিন শ্বশুর-পরিবারকে নাজিরহাট কলেজের আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে তাঁদের গাড়ি চালিয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসব।

নাজিরহাটে আহমদ পাবলিশার্সের-এর মহিউদ্দিন সাহেবের জামাতা ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূইয়াঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের যুদ্ধপরিস্থিতি বর্ণনা করেন। আমি একা গাড়ি চালিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অর্থাৎ নাজিরহাট থেকে হাটহাজারী, তারপর রাউজান ঘুরে রাঙ্গুনিয়ায় এলাম। আমাদের গ্রামের সংকীর্ণ সড়কে ঢোকার পথে পড়ে একটা কালভার্ট। বেশ কায়দা করে সাবধানে পার হতে হয়। এ সময়ে দীর্ঘদেহী এক পুরনো বন্ধুর দেখা ঃ

'আরে আপনি এখানে?'

'আর আপনি?'

'এটা তো আমার গ্রাম'।

'ও তাই! আমি আছি পাশের গ্রামে এক আত্মীয় বাড়ি। আমার কাতালগঞ্জের বাড়িতে বন্দর থেকে নিক্ষিপ্ত শেল এসে পড়ছিল। ওখানে আর থাকা গেল না। তাই পূবদিকের রাস্তা ধরে এখানে। কিন্তু ডক্টর কোরেশী, কাপ্তাই রোডের এত কাছে আপনার বাড়ি, এখানে তো আপনার থাকা চলবে না!'

'কেন?'

'যে–কোন সময় মিলিটারি আক্রমণ হতে পারে। আর আপনার নাম তো ওদের তালিকায় নিশ্চয়ই উপরের দিকেই আছে। যাহোক, আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের সবারই একটা উপায় হতে পারে।'

'ঠিক আছে, কাল সকালে আসুন আমার বাড়িতে'

পরদিন সকালে সেই বন্ধু (যাঁর সঙ্গে রয়েছে একটু আত্মীয়তার সম্পর্কও), এম.এ. জিন্নাহ এলেন আমাদের বাড়িতে। মীরেরসরাইর প্রখ্যাত কৃষিবিদ, শেরে বাংলার মন্ত্রী মাহফুজুল হক সাহেবের পুত্র, পরে *দৈনিক দিনকাল* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি এসে জানালেন, তাঁর সমস্যার কারণ– তাঁর ল্যান্ডরোভার গাড়ি আছে কিন্তু তেলের অভাব, সঙ্গে জর্মন স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্র-কন্যা এবং তাতে রাস্তায় কিছুটা সিকিউরিটি সমস্যা দেখা দিতে পারে, এমনকি তাঁকেও অবাঙালি মনে করতে পারে অনেকেই। তাই আমার 'প্রটেকশানে' (যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক) রামগড় গিয়ে আমাদের নামিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে চলে যেতে পারবেন। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় আমাদের তেল সংগ্রহ করতে হবে। ঠিক হল, পরদিন সকালে আমরা রওনা দেব। আমাদের উঠানে রাখা ২ টা গাড়ি থেকে পাইপ দিয়ে তেল যা আছে তা তাঁর গাড়িতে ভরা হল। এখানে আমাদের আর্থিক সংগতির বিবেচনাটাও আনতে হবে। আমার বাবা অনেক চেষ্টা করেও বন্ধু ও বর্গাচাষীদের কাছ থেকে তিনশোর বেশি টাকা সংগ্রহ করতে পারেননি। তার থেকে আমাদের দিলেন দেড়শো টাকা। আমার ছোটবোন বুলবুল দিল পঞ্চাশ টাকা। পাশের গ্রাম মরিয়ম নগরের বন্ধু কালো সওদাগরও দিতে পারল মাত্র একশ পঞ্চাশ টাকা। আমার স্ত্রীর কাছে সে মাসের বাড়ি ভাড়াটা থেকে গিয়েছিল–তিনশ টাকা। সর্বমোট নয়শ কি এক হাজার টাকা আমাদের দু'জনের সম্বল।

আবার কুণ্ডেশ্বরী

রাউজান এসে কুণ্ডেশ্বরীর প্রফুল্ল সিংহের কাছ থেকে অল্প তেল এবং কিছু টাকাও ধার নেওয়া গেল। সম্ভবত দুইশ পঞ্চাশ টাকা। প্রফুল্ল তাঁর বাবার কাছ

থেকে আমার জন্য যে টাকাটা নিয়েছিলেন পরে, স্বাধীন বাংলাদেশে, তাঁকে তা ফেরত দিতে গিয়ে গ্রহণ করাতে পারিনি। কারণ, তাঁর সেই এক কথা, 'যিনি টাকা দিয়েছিলেন তিনি তো নেই, এই টাকা আমি কাকে দেব?' মনে পড়ে শেষবার কুণ্ডেশ্বরী ছেড়ে আসার আগে আমরা মন্দিরে গিয়ে নূতন সিংহ মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। আমার স্ত্রী তাঁকে কদমবুসি করেন, আমি হাত তুলে সালাম জানাই। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই মহান ব্যক্তিত্বের স্মরণে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ করে এবং স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। নাজিরহাটে খুব উচ্চমূল্যে কিনতে হল পেট্রোল। তারপর ভাঙ্গা রাস্তা, খাল-বিল পার হয়ে জিন্নাহর গাড়িতে আমরা বিকেলে রামগড় এসে পৌছালাম।

রামগড়

একান্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল। কিন্তু প্রকৃতির অকৃপণ অনুদানে ভরপুর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্বাপর এখানে পিকনিকে এসেছি কয়েকবার। চা-বাগানগুলো সেজন্য আমাদের কাছে ছিল খুবই প্রিয়।

আমার শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁদের দুই কন্যাসহ জামাতাদের সপরিবারে পেয়ে খুবই উৎফুল্ল। আমি জিন্নাহকে নিয়ে মুক্তিফৌজের হেড কোয়ার্টারে গিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে কয়েক গ্যালন পেট্রল পেলাম। সেখানে সম্ভবত তখন দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন রফিক। জিন্নাহ সোজা রাস্তায় চলে গেলেন মীরেরসরাই।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কুণ্ডেশ্বরীতে শেষ দেখার বেশ কয়েক দিন পর ড. আনিসুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি প্রথমে কাটিরহাট এবং পরে রামগড় এসে থাকেন চা বাগানের ম্যানেজার, তাঁদের পারিবারিক বন্ধু সুবা ভাইয়ের বাসভবনে।

রামগড়ে চারদিন কাটল নানা জনের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনায়। তবে প্রস্তুতি-পর্বের বহু কাজকর্ম সেখানে চলছিল। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী ছাত্র জনতার প্রশিক্ষণ দেখছিলাম খোলামাঠে। অনেকে আমাদের কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করত। আমরা সানন্দে সাড়া দিতাম এবং দীর্ঘ সময় কাটাতাম নানা আলোচনায়। তবে প্রত্যাশিত পত্রিকা বের করার কিংবা দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ সেখানে ছিল না। বরং অনতিবিলম্বে ভারত গমনের নির্দেশ এসে গেল। তার আগে এক বিষণ্ন বিকালে বিধ্বস্ত প্রফুল্ল সিংহ এসে হাজির। কোন রকমে মুখ দিয়ে বের করলেন, বাবা নেই। ওঁর দুঃখে সবাই সমব্যথী। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই কারো।

ইতিমধ্যে আরো খবর পাওয়া গেল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব এবং আমাদের ছাত্র, ডাঃ জাফরের শ্যালক ফরহাদ

পাক সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। দু'জনেই ছিল আমার খুব কাছের লোক। আব্দুর রবসহ দশজন ছাত্রকে নিয়ে ক'মাস আগে আমাকে দলনেতা রূপে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। তাছাড়া চার মাস আগে আমার বিয়ের সময় থেকে খুবই কাছের প্রতিবেশি ডাঃ জাফরের পরিবার ছিল একান্ত আপনজন।

এস.ডি.ও-র পড়ো বাংলোয় কাঠের ফ্লোরে ড. মল্লিক ও অধ্যাপক আহসানের পরিবার রাত্রিযাপন করছিলেন তখন। আমরাও কাঠের ফ্লোরে শয্যাগ্রহণ করলাম সেখানে।

এভাবে যেখানেই যাই, মার্চের দিন ও রাত আমাদের স্মরণে আসে। কখন যে মার্চ পেরিয়ে এপ্রিল এসে গেল, বাংলা বর্ষ শেষ হয়ে যেয়ে নববর্ষের সূচনা হতে যাচ্ছে তা আমাদের বোধগম্যতায় আসছিল না। কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারিনা সেইসব অভিজ্ঞতার কথা। তবে পরবর্তী ন'মাস আমাদের জন্য নিষ্কর্ম, নিরুদ্বিষ্ট ছিল না, বরং কর্মমুখর এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিল। কিছুটা দুঃসাহসিকও বটে, কিন্তু তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে অন্য অনেকের মতো আমার জীবন।

আগরতলা : নরসিংগড় পর্ব

১৫.০৪.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

এই দিনের কিছুই ডায়েরীতে লিখিত হবার কথা নয়। কারণ ডায়েরীটিও তখন আমার ছিল না। আমার ছোট শ্যালক সিমাব (সৈয়দ আলী-উল-আমিন) কোলকাতা যাবার প্রাক্কালে এটি আমাকে দিয়ে বললো, 'আপনার হয়তো কাজে লাগবে।'

পরবর্তী কালে আমি এই আজকের তারিখে দুটি অসমাপ্ত-বাক্য লিখেছি : 'রামগড় থেকে নদী পার হয়ে সাবরুম। সেখান থেকে বাসে রওনা দিলাম আগরতলা।'

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *'যখন সময় হল'* গ্রন্থে এই পর্বের কিছু সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। আমি শাদামাটাভাবে যা বলতে পারি তা হল, রামগড় থেকে ছোট নদীর ওপর একটি সরু সাঁকো পার হয়ে আমরা সাবরুমে এলাম। দুদিন আগে আমি ড. মল্লিকের বড় ছেলে ফিরু ভাইয়ের সাথে এসে কলকাতায় দুটি পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছিলাম : ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুকে। বিদেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। যাহোক, ১৫ এপ্রিল, ১ লা বৈশাখ আমরা সাবরুমে এসে একটা লক্কর-ঝক্কর বাসে উঠে বসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই আমরা আছি : ড. মল্লিকের, সৈয়দ আলী আহসানের এবং ড. রশীদুল হকের পরিবার। তাছাড়া ভাইদের নিয়ে মোহাম্মদ আবু জাফর এবং অনুপম সেনও ছিলেন বলে মনে পড়ে।

আমাদের এই সময়ের মনোভাব বর্ণনা করা খুব মুশকিল। গ্রাম ছেড়ে আমরা যখন জিন্নাহর গাড়িতে রওনা দিচ্ছি তখনকার বিদায়-দৃশ্যের কথা কখনো ভোলা যাবে না। অশ্রুসিক্ত মাকে দেখলাম তাঁর চৌহদ্দি পেরিয়ে অনেকদূর এসে আমাদের বিদায় দিচ্ছেন। আমরা তখনও দেশ ছেড়ে যাব তা ভাবিনি। হয়তো রামগড়ে অবস্থান করে, কাজ করতে করতে দেশ অল্প সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে বহির্বিশ্বের চাপে স্বাধীন হয়ে যেতে পারে–এমন একটা অলীক স্বপ্ন অনেকের মনে ছিল বৈকি!

কিন্তু এবার রামগড়ের ছাত্র-জনতা, মুক্তিফৌজে প্রশিক্ষণার্থীদের ছেড়ে এসে সবারই ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। দীর্ঘ নীরবতাপূর্ণ বাস-জার্নি হয়তো তারই স্মৃতি বহন করছিল। বাইরে স্থানীয় লোকজন হৈ-হুল্লোড় করছিল, এমন কি আমাদের গান-'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই...' প্রভৃতিও গাইছিল।

আগরতলায় রাজবাড়ি সংলগ্ন গ্র্যান্ড হোটেলে অনেকের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে লোকজন বেশি থাকাতে ডাইনিং রুমে আমাদের থাকার আয়োজন, দু'রাত বিদঘুটে দুর্গন্ধের মধ্যে রাত্রিযাপন। দিনের বেলা অবশ্য বাইরে সুন্দর পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে সাহিত্যিক আহমদ ছফা হঠাৎ এসে উপস্থিত। তাঁর কাছ থেকে ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানা গেল। সে এক ভয়ানক ট্র্যাজেডি— ছফা বর্ণনা করতে গিয়ে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর কম্পমান কণ্ঠ অনেক সময় বোধগম্য হচ্ছিল না।

পরদিন আমার সহপাঠী বদরুল হাসানের সঙ্গে দেখা। সে শিল্পী কামরুল হাসানের ছোট ভাই এবং ভয়ানক রসিক ছিল ছাত্রাবস্থায়। সম্প্রতি কুমিল্লা সরকারি কলেজের শিক্ষক। আগরতলা এসেছে সস্ত্রীক। এখানকার কলেজ প্রাঙ্গণে নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে অধ্যাপক আহসানকে প্রধান অতিথিরূপে দাওয়াত দিতে যাঁরা এসেছেন বদরুল ছিল তাঁদের সঙ্গে। এরপর থেকে বদরুল আর আমি অনেক সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বিষয়ে ভাব বিনিময় করেছি। পরে কলকাতায় সে আমাদের বাসায় এসেছে, আমিও তার বাসায় গিয়েছি এবং সেখানে কামরুল হাসানকে চিত্রাংকনরত দেখেছি।

আগরতলা কলেজে নববর্ষ উদযাপন ছিল ছিমছাম। অল্প কয়েকটি বক্তৃতা ও গান দিয়ে গাঁথা। আব্বুর বক্তৃতা খুবই প্রশংসিত হলো। সেখানেই ঢাকার কথা-সাহিত্যিক সত্যেন সেন এবং স্থানীয় অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ীর সঙ্গে পরিচিত হই।

দু'দিন পর আমরা চলে এলাম নরসিংগড়। মাইল দশেক দূরে। সেখানে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ছাত্রাবাসে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। ছাত্রাবাসটি শীঘ্রই পরিত্যক্ত ঘোষিত হবে কারণ নতুন পাকা দালান নির্মাণ তখন শেষ পর্যায়ে। এটা ছিল হাফ কাঁচা, হাফ পাকা। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে আমি ঠিক এই ধরনের নীলক্ষেত ব্যারাকে দু'তিন মাস অবস্থান করি। গ্রীষ্মের ছুটিতে পলিটেকনিকের ছাত্ররা প্রায় সবাই চলে গিয়েছে। যারা ছিল তারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। শেষ মুহূর্তে দেখা গেল ঢাকার তরুণ গায়ক মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার ও আপেল মাহমুদ এসে হাজির। সবার অনুরোধে তাঁরা কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন।

এখানে আমরা তিনটি কক্ষ পেয়েছিলাম। প্রথমটাতে আব্বু, মা-মণি, মেহরাব, সিমাব, শামীম মামা, (আমার স্ত্রীর সহপাঠী, মা-মণির খালাতো ভাই) এবং আশ্রিতা চম্পা খালা। দ্বিতীয় কক্ষে আমার স্ত্রী ও আমি। একটা সিংগল খাট। এটা শরণার্থী অধ্যাপক পরিবারবর্গের কমনরুমের মত ব্যবহার হতো। অনেকেই তাস, লুডু ও ক্যারম খেলতো। ছোটখাটো বৈঠকও বসত। একবার মাহবুবুল আলম চাষী ও

তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এসেছিলেন। সবাই মিলে হবু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি বিশেষ একাডেমিক কোর্সের পরিকল্পনা করলাম। প্রশিক্ষকদের মধ্যে ড. আনিসুজ্জামান, ওসমান জামাল ও আমার যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু শেষ অবধি কাউকে যেতে হয়নি। আমার বন্ধু বদরুল হাসান যোগ দিয়েছিল, জেনেছি। নরসিংগড়ে যাবার আগে কর্নেল চৌমুহনী নামক এলাকায় জয় বাংলার অফিসে গিয়ে আমি মাহবুবল আলম চাষীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে আসি। তাঁর সঙ্গে ১৯৬৫ সালে আমার প্রথম পরিচয়। সূত্র ছিল আমার ছোট ভাই আকবর শাহ কোরেশী (ডাক নাম কেনু)। সে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন (ডাকসু)-র নির্বাচিত সদস্য–কমনরুম সেক্রেটারি। এপ্রিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর দিয়ে মিজোরাম এলাকায় পৌঁছুলে ডিসেম্বর অবধি সে প্রায় বন্দিদশায়, ভয়ানক দুর্দশায় ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইউ.এন.ডি.পি-র কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং দীর্ঘদিন আগে ইন্তেকাল করেছে। যা হোক, সে ছিল চাষীর খুব স্নেহভাজন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে মাহবুবুল আলম আমাদের বাড়ি থেকে তিন-চার মাইলের ব্যবধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু জমি লীজ নিয়ে 'চাষী' নামে একটি খামার বাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং বহু রকমের চাষবাস শুরু করেন। পরে কেনুকে রাঙ্গুনিয়া এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব দিয়ে একটা চাকুরিতে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আইন পড়ার অজুহাতে ঢাকায় থেকে যায়। ১৯৬৮/৬৯ সালে একবার আমি একা এবং পরেরবার সি.এস.পি. এ.কে.এম আহসানকে সার্কিট হাউজ থেকে আমার গাড়িতে চড়িয়ে চাষীর কাছে নিয়ে যাই। যাহোক, এখন আগরতলায় আমি তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্বে খুব কর্মলিপ্ত দেখতে পাই। অজস্র শরণার্থীর আগমন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও আরো বহু সমস্যা নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত।

নরসিংগড় থেকে গিয়ে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে আমি চাষীকে জানাই যে, ফ্রান্সের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সেখানে আমার থিসিস প্রকাশিত হয়েছে। আমার সাবেক বস্ ও বন্ধু জিল ফিলিবের এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। চাষী আমাকে সেই সব যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে বলেন।

আমরা নরসিংগড়ের কথায় আবার ফিরে আসি।

নরসিংগড়ে আমার পরের কক্ষে ছিলেন ভায়রার পরিবার। তারপর ড. রশিদুল হক (গণিত) ও ড. আনিসুজ্জামানের পরিবার। ড. শামসুল হক (পদার্থ) ও ওসমান জামাল (ইংরেজি) প্রমুখরা ছিলেন পাশের সারিতে।

কলকাতায় পররাষ্ট্র সচিবরূপে যোগদানের পূর্বে মাহবুবুল আলম চাষীর বড় কাজ– তাঁর নেতৃত্বে ড. এ. আর. মল্লিক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ড.

আনিসুজ্জামান এবং আরো দু'তিনজনের মধ্যে আমি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্ণরের বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হই। আমাদের মুখপাত্ররূপে তিনি মুক্তিফৌজ ও শরণার্থীদের প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরেন। মাদাম গান্ধীর সরল, সহৃদয় মনোভাবাপন্ন কথাবার্তায় আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সঙ্গেও আমার সামান্য আলাপ হয়।

সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

'ইন্দিরা গান্ধী আগরতলায় এসেছেন মে মাসে অথবা জুন মাসের শুরুতে। তারপরে এলেন উড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথী। ইনি যখন এলেন তখন আমাদের মধ্যকার অনেকেই কলকাতা চলে গেছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি এবং আমার জামাই ড. কোরেশী। নন্দিনী শতপথীর সঙ্গে ছিলেন ড. ত্রিগুণা সেন। ত্রিগুণা সেন পণ্ডিত নেহেরুর আমলে কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তার আগে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মাহবুবুল আলম চাষী সে সময়ে আগরতলায় ছিলেন না। জুন মাসেই কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।'[৭]

ব্যক্তিগতভাবে এ সময়ে আমার কাছে আসে সবচে' সুখের মুহূর্ত যার একটু বিশদ বর্ণনা এখানে দেয়া প্রয়োজন :

একদিন দুপুরবেলা পলিটেকনিক হোস্টেল-সংলগ্ন প্রিন্সিপালের বাসায় আমার ফোন এল। দত্ত বাবুর অফিসে আমার একটি বুক পার্সেল এসেছে প্যারিস থেকে। সেটা আনতে যেতে হবে। এ সময়ে শুনলাম, এক বড়সড় আকৃতির ব্যক্তি এসে আমাকে খোঁজ করছেন। একটু তাকিয়ে দেখি : আমাদের গ্রামের সহপাঠী বন্ধু সরোজ মুৎসুদ্দী। ওর সঙ্গে অন্তত দু' দশক দেখা নেই। কিন্তু কৈশোরের স্মৃতি কি আর ভোলা যায়? দীর্ঘ আলিঙ্গনের পর জানলাম : সরোজ গৌহাটিতে থাকে, ব্যবসা ও কন্ট্রাকটারি গোছের কিছু করে এখন যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। পরিবারের লোকজনের খোঁজ নিতে আগরতলা এসেছিল। কিন্তু তাদের কেউ আসেনি, পাড়ার দু-চার জন লোক এসেছে, তাদের কিছু টাকা পয়সা দিয়ে আমার খোঁজ পেয়ে নরসিংগড় চলে এসেছে। আমি অভিভূত! সামান্য চা-বিস্কুট খেয়ে সে আমাকে ও আমার শ্যালক মেহরাবকে নিয়ে চলল আগরতলা। একটা মিষ্টির দোকানে নিয়ে বলল, খাও, যা খুশি! কিন্তু আমি মিষ্টি বেশি খাইনা। মেহরাবও দু তিনটা খাওয়ার পর আর খেল না। এক পর্যায়ে আমার হাতে কিছু অর্থ গুঁজে দিয়ে বলল : 'এখন আর বেশি নেই।

---

[৭] *যখন সময় এল*, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ পৃ ৪৫।

প্রয়োজনে পত্র দিও।' আমি নিতে না চাইলেও সে জোর করে টাকাটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এরপর গেলাম দত্ত বাবুর অফিসে। কে.পি.দত্ত মহোদয় হলেন, শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য। তাঁর অফিস থেকে আমার বইয়ের পার্সেল যোগাড় করে দেখলাম : সত্যি আমার থিসিস! আমার পাঁচ বছরের সাধনা! তারপর আরো পাঁচ বছর প্রকাশনার জন্য প্রতীক্ষা। অবশেষে মেহরাবসহ কিছু মিষ্টি কিনে নরসিংগড়ে ফিরলাম। মা-মণির হাতে মিষ্টির হাঁড়িটা দিয়ে বললাম, 'দোয়া করবেন! আমার থিসিস প্রকাশিত হয়ে এসেছে প্যারিস থেকে, তাই সবাই যেন একটু মিষ্টি মুখ করে!'

জুন মাসের ৩ তারিখ আমরা কলকাতা যাই (ঐ ৫০)১

পুনশ্চ

ডায়েরির সাক্ষ্য ব্যতিরেকে লেখা আগরতলা-নরসিং গড় পর্বের কাহিনী এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল? অথচ কত ঘটনা, কত ব্যক্তির সাক্ষাৎ আর কত নতুন অভিজ্ঞতা হল সেখানে! প্রথমে মনে পড়বে মাসুদ ভাই সহ বাজারে সবার নাশতা আনতে গিয়ে দু-আনা দশ পয়সা দিয়ে কাঁঠাল কিনে ঘরে ফেরা আর হাজির হুল্লোড়ে যোগদান!

তারপর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল মহোদয় ও তাঁর স্ত্রীর কথা–টেলিফোন ধরতে কিংবা পত্রিকা পড়তে গিয়ে আমরা তাঁদের প্রয়শ বিরক্ত করেছি। এক্ষণে তাঁদের জীবিত সদস্যদের ও উত্তরাধিকারীদের জন্য আন্তরিক শুভকামনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আর দুটো ঘটনা বিশেষভাবে মনে পড়ে। খবর পেয়ে বন্ধু জহিরউদ্দীন খানের সঙ্গে একটা চমৎকার বাঙলোয় সাক্ষাৎ করতে যাই। সেখানে চট্টগ্রামের জননেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু। একটু অসুস্থ মনে হলো। জহিরের সঙ্গে চট্টগ্রামে ফেলে আসা আমাদের ঋতুরও পত্রিকা বের করবার কথা রশীদ ও সুচরিতসহ নানা বিষয়ে অনেক আলাপ এবং যথারীতি আপ্যায়ন।

একই দিনে সার্কিট হাউসে গিয়ে সদ্য দেশাগত ব্যরিস্টার মউদুদ আহমদের সঙ্গে মোলাকাত। তাঁর কাছ থেকে আদ্যোপান্ত বঙ্গবন্ধু বিষয়ক নির্ভরযোগ্য কাহিনী জানা গেল। পরে মুজিবনগরের বাংলাদেশ মিশনে আমরা অনেক কাজ করেছি এক সাথে। তবে তাঁর মতো কর্মিষ্ঠ আমি আর কাউকে দেখিনি সেখানে।

কোলকাতা পর্ব

শরণার্থী জীবনে আগরতলা থেকে কোলকাতা গমন সবার জন্যই একটা বড় ঘটনা। আশ্চর্য, তার কোন রেকর্ড আমার কাছে নেই। তখন অবশ্য বিমানের টিকেট, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির আমন্ত্রণপত্র, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি ইত্যাদি ছিল। এখন পরোক্ষ সূত্রে তারিখ সংগ্রহ, স্মৃতির রেশ টেনে কিছু পুরোনো প্রসঙ্গ তুলে ধরা যেতে পারে। সম্ভবত মে মাসের শেষের দিকে আমরা বেশ ক'দিন অপেক্ষার পর কোলকাতার বিমান টিকেট পেলাম। তখন এক একটা দিনকে মনে হতো যেন অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কারণ আলী আহসান সাহেব কলকাতা গমনের তারিখ লিখেছেন ৩রা জুন। আমরা দু'জন একসঙ্গে রওনা দিলাম, আগরতলা–গৌহাটি–কোলকাতা। আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন ড. অনিরুদ্ধ রায় (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক এবং প্যারিসে গবেষণারত পর্যায়ে তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রানীসহ সুপরিচিত বন্ধুজন) ও ড. আনিসুজ্জামান। প্রথমে অধ্যাপক সাহেবকে এক অভিজাত পরিবারে নামানো হলো। গৃহস্বামী হিন্দু, বড় চাকুরে, তাঁর স্ত্রী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলা, সম্ভবত অধ্যাপিকা। সেখানে আমাদের পরিচিত পাবনার জেলা-প্রশাসক নুরুল কাদের খানও ছিলেন।

আমাকে গড়িয়াহাটের কাছে ড. সুকুমারী ভট্টাচার্যের বাসায় রেখে আসা হল। ছোট ছিমছাম বাসা, মা ও মেয়ে থাকেন। আমাকে মেয়ের কক্ষে দু'তিন রাতের মত অতিথির মর্যাদা দেয়া হলো। ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর পরলোকগত স্বামী প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। কন্যা সুতনুকা ইতিহাসের ছাত্রী এবং প্রখ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকারের ছেলে পরবর্তীকালে খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ সুমিত সরকারের বাগদত্তা। শয়নকক্ষে শুয়ে আমি সুমিতের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কিত অভিসন্দর্ভটি উল্টেপাল্টে দেখলাম। ড. খান সরোয়ার মুর্শিদের কন্যাদের সেখানে অবস্থানের সুযোগ করে দেবার জন্য এরপর আমাকে নিয়ে আসা হলো মৈত্রেয়ী দেবীর স্কুলে।

সেখানে একটি কক্ষে এক আহত মুক্তিযোদ্ধার বিছানার মোটা বড় কিন্তু ছেঁড়া তোষককে মাথার বালিশ করে আমরা চারজন ফ্লোরে নিজস্ব চাদর বিছিয়ে শুতাম।

চারজনের একজন ড. বেলায়েত হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক যিনি ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে কবির উদ্দিন আহমদের সঙ্গে প্যারিসে আমার কাছে এসেছিলেন *Unhappy East-Pakistan* পুস্তিকা নিয়ে; তাছাড়া, অধ্যাপক আবুল ফজলের ছেলে আবুল মনজুর (পরে যিনি চট্টগ্রামে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন) এবং আমি। আরেক জনের নাম এখন স্মরণ করতে পারছি না।

অন্যদিকে দু'তিন দিনের মধ্যে অধ্যাপক আহসানকে নিয়ে আসা হলো পাম এভিনিউতে, ব্যারিস্টার আব্দুস সালামের বাসায়। তিনি ঢাকার ছেলে, আব্বুর ছাত্র। ভাষা আন্দোলনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়াতে বায়ান্ন সালে কোলকাতা চলে যান বলে শুনেছি। তাঁর বাসায় ইতোমধ্যে সাদেক খান, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও এম.এল.এ সুবিদ আলীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

এদিকে আমি তখন প্যারিসে ফরাশি বন্ধুদের কাছ থেকে অল্প অর্থ সাহায্য পেয়েছি।[৮] সুতরাং স্ত্রীকে আগরতলা থেকে কোলকাতায় এনে মহিলা গাইনি ডাক্তার দেখানোর জন্য সচেষ্ট। আগরতলায় কোন মহিলা গাইনির খোঁজ পাওয়া যায়নি। আবার কোলকাতায়ও বহু তালাশ করে ছোটবড় কোন বাসা পাওয়া গেল না। অথবা বিজ্ঞাপনদাতা হিন্দুদের কাছে মুসলমান বলে আর মুসলমানদের কাছে আমরা পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলছি এই অজুহাতে খালি বাড়িও ভাড়া পেলাম না।

মৈত্রেয়ী দেবীর স্কুলে তিন-চার রাত নির্ঘুম কাটালাম। অবশেষে ড. অনিরুদ্ধ রায় এসে সুখবর দিলেন– রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে দশ দিনের জন্য একজন শরণার্থী বুদ্ধিজীবীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি তাঁর গাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে অর্থাৎ গোলপার্কে এবং বলে গেলেন, বিকেলে মহারাজ তথা ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্তাকে যেন ধন্যবাদ জানাতে যাই। আমি আমার থিসিসটি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। জানলাম যে, তিনি প্যারিসে কয়েকবার বক্তৃতা করতে গিয়েছেন এবং আমার সুপারভাইজার অধ্যাপক লুই রনু তাঁর বন্ধু মানুষ। পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ক্যান্টিনের ম্যানেজার (একজন মাদ্রাজি মহিলা)-কে ফোনে বললেন ঃ

---

[৮] প্যারিসে যে প্রতিষ্ঠানে আমি চার বছর পড়িয়েছিলাম তার বাংলার অধ্যাপক ফিলিবের এবং দু'তিনজন ছাত্র এই অর্থ প্রেরণ করেন। ফ্রান্স থেকে তখন কেউ বছরে মাত্র তিনশ ফ্রঁ বাইরে পাঠাতে পারতেন। আমার কাছে সর্বমোট চার-পাঁচটি ব্যাংক ড্রাফট হয়তো এসেছিল এবং আমি খুব সম্ভব তিনটি পেয়েছিলাম।এক-একটিতে চার/পাঁচশ রুপির মত ছিল বলে মনে পড়ে।

আমাকে সব মিল যেন ফ্রি খাওয়ানো হয়। সব মিল মানে বেড টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটারনুন হাইটি এবং ডিনার। ইতিপূর্বেই আমাকে প্রবেশ পথে নিচ তলায় একটি কক্ষ দেয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে সেই ইন্টারন্যাশনাল স্কলার্স হাউজ-এ ঢুকছি, দেখলাম, মহারাজ আসছেন। তিনি বললেন, 'দেখি, ড. কোরেশী, আপনি কেমন আছেন।' তিনি আমার সঙ্গে শুধু একটি ছোট এ্যটাচি কেস দেখে আহত হলেন। সেটিও ছিল আলী আহসান সাহেবের একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে একটা বেয়ারা ডেকে হুকুম দিলেন, ব্যাগটা সহ আমাকে ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউজে নিয়ে যেতে। সে এক রাজকীয় ব্যবস্থা! অন্তত আমার জন্য। আমি বলতাম, ইন্টেলেকচুয়েলস' ইন্টারকন্টিনেনটাল! পরদিন এক ইংরেজ মহিলা এসে আমার সাক্ষাৎকার নিলেন এবং জুন মাসের ইনস্টিটিউট বুলেটিনে তা ছাপলেন।

ইতোমধ্যে আব্বুর সঙ্গে আমি এক সকালে অন্নদাশংকর রায় ও লীলা রায়ের বাসভবনে গেলাম। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে প্রচুর সমাদর করলেন। অন্নদাশংকর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক আলী আহসানের বই-পত্র কোলকাতায় প্রকাশ করা যায় কিনা এবং তাতে তাঁর কিছু অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা হয় কিনা দেখতে। তিনি স্বহস্তে লিখে ১২.০৬.১৯৭১ তারিখে ডি.এম. লাইব্রেরির শ্রী গোপাল দাশ মজুমদারের কাছে একটি পত্র দিলেন আমার হাতে।

অন্যদিকে ঠিক হলো লীলা রায়ের সঙ্গে বসে আমি বাংলাদেশের সাহিত্য থেকে নির্বাচিত অংশ, বিশেষ করে কবিতা, ইংরেজি ও ফরাশিতে অনুবাদ করবো। তবে তার আগে আমাদের একটু থিতু হয়ে বসতে হবে।

ড. অনিরুদ্ধ রায় তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রানী রায়ের কাছে প্যারিস থেকে বন্ধুদের প্রেরিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রেস- ক্লিপিংগুলো আমাকে অনুবাদের জন্য দিয়ে যেতে লাগলেন। এগুলো পরে অল ইন্ডিয়া রেডিও, স্বাধীন বাংলা বেতার ও বাংলাদেশ বুলেটিনে (ব্যারিস্টার মওদুদ সম্পাদিত) পঠিত ও প্রকাশিত হতো।

তাছাড়া, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির কার্যালয়ে গেলাম কয়েকবার। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। স্মরণযোগ্য তেমন কিছু ঘটলো না। এক পর্যায়ে বাংলাদেশি শিক্ষকদের একটা সভা হল। সেখানে ড. এ. আর মল্লিক সভাপতি এবং ড. আনিসুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক হলেন। এর মধ্যে ড.মল্লিকের বাসায় অন্তত দু'বার গিয়েছি। তিনি তখন পার্ক স্ট্রিটে লন্ডনে পরিচিত এক অধ্যাপিকার বাসায় অতিথি ছিলেন। তাঁর পরিবার তখনও আগরতলায়।

আগরতলায় থাকতে 'দেশ' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা বেরিয়েছিল আমাদের উদ্দেশ্যে– নাজমা অর্থাৎ আমার স্ত্রী নাসরিন ও শামসুদ্দিন অর্থাৎ আমার নামের পরিবর্তিত রূপ। কোনক্রমে তাঁর প্রিয় কথাশিল্পী শামসুদ্দিন আবুল কালাম নন। কেননা তিনি তখন ইতালী প্রবাসী আর কবিতাটির শিরোনাম হলো 'কোনো এক নব দম্পতিকে-চট্টগ্রামে'। সাবরুম থেকে লেখা আমার চিঠি পেয়ে তিনি তাঁর একান্ত অনুগত সহকর্মী ড. নরেশ গুহকে আমার দেখভাল করবার কথা বলেছিলেন। ড. নরেশ আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর অতি ছোট দু'কামরার ফ্লাটে থাকবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানে প্রচুর পরীক্ষার খাতা, তাঁর স্ত্রী ও এক কিশোরী কন্যা। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হল।

একদিন 'স্ট্যাটস্‌ম্যান' পত্রিকায় পড়লাম, ব্রিটিশ কাউন্সিলে বুদ্ধদেব বসু কবি কীটসের উপর বিকেল চারটায় বক্তৃতা করবেন। বহু কষ্ট করে ঠিকানা পেলাম এবং যথা সময়ের বেশ আগে সেখানে হাজির হলাম। পৌনে চারটায় দেখি চট্টগ্রামের শিল্পপতি এ.কে.খান সেখানে উপস্থিত। আমি তাঁর কাছে গিয়ে সালাম জানালাম। আমাকে দেখে তিনি অবাক হলেন। তাঁর বড় ছেলে জহিরের খবর জানতে চাইলাম। তিনি ফোন নাম্বার সহ ক্যামাক স্ট্রীটের একটি ঠিকানা দিলেন। তবে সাবধান করে দিলেন অধ্যাপক আহসান ছাড়া অন্য কাউকে যেন তা' না জানাই। সে বাসায় আমি দু'তিনবার গিয়ে জহিরের অনুপম সান্নিধ্য উপভোগ করি। তিনি তখন দারু শিল্পের দিকে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে পড়ে।

অন্যদিকে ড. নরেশ গুহের সঙ্গে আমি কয়েকবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যাতায়াত করি। তিনি আমাকে একটি বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ জানাবেন বললেন। কিন্তু তার আগে সৈয়দ আলী আহসান, প্রখ্যাত নাট্যজন শম্ভু মিত্রের বক্তৃতা রয়েছে। দু'টি বক্তৃতা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। শম্ভু মিত্রের বক্তৃতার পর একই গাড়িতে আমাকে পাম এভিনিউয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন তিনি আমাকে তাঁর প্রযোজিত একটি নাটক দেখতে আমন্ত্রণ জানান। তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয়ের সেই নাটকটি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

কথায় কথা বাড়ে। আবার হারিয়েও যায়। বুদ্ধদেব বসুর কথা বলছিলাম। তাঁর বক্তৃতার পর অন্য অনেকের প্রশ্ন বা আলোচনার শেষে আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে আমার কুশলবার্তা জানলেন। পরে জানালেন যে, তিনি ইউরোপে যাচ্ছেন সত্বর, ফিরলে আমি যেন তাঁর সাথে দেখা করি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি চলে গেলাম বাইরে। ফিরে যোগাযোগ করলে জানতে পারি তাঁদের নতুন বাড়ির এলাকাটি নকশাল অধ্যুষিত। সুতরাং আমার অন্তসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। দুর্ভাগ্য, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ

হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুর সঙ্গে আমাদের দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং মহাসমাদরে আপ্যায়িত হয়েছি। এখনও অপ্রকাশিত তাঁর একটি সাক্ষাৎকারও আমার কাছে রয়েছে।

এদিকে গ্রীষ্মের অবকাশ ঘনিয়ে আসছে। অবশ্য ইতোমধ্যে আমাকেই চলে যেতে হলো দিল্লী। তবে এর মধ্যে দেশবন্ধু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে বাংলার নব জাগরণ বিষয়ে আমি একটি বক্তৃতা করি এবং এর প্রস্তুতির জন্য রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে কিছু পড়াশোনা করি। সে সুবাদে আমি ড. ডেভিড কফের গবেষণার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই।

প্যারিসে পরিচিত কোলকাতার বন্ধু ক'জন খবর পেয়ে দেখা করতে এল। তাদের মধ্যে সবচে' আন্তরিক ও কাছের মানুষ ছিল শিল্পী সুনীল দাশ। ওর কালিঘাটের বাড়িতে একা এবং সস্ত্রীক কয়েকবার মাছভাত খেয়েছি। সর্বশেষ ২০০৫ সালে এক সংক্ষিপ্ত সফরে গিয়েও আপ্যায়িত হয়েছি। সুনীল যেমন বড় মাপের শিল্পী, তেমনি অতি ভালো মানুষও বটে। ২০১৫ সালে সুনীলের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে আমি 'দৈনিক প্রথম আলো' য় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

ব্যারিস্টার এ. সালামও খুব সহৃদয় ব্যক্তি। বাংলাদেশের কয়েকজনকে আশ্রয়দান ছাড়াও কিছুকাল তাঁর বাড়িটা ছিল যেন সৈয়দ আলী আহসানের বৈঠকখানা। প্রায় দরবার বসত সেখানে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৬২ সালে প্রথমে বসটন ও ফিলাডেলফিয়ায় এবং ১৯৬৭ সালে বুখারেশ্‌তে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ১৯৭১ সালে তাঁর বাসায় আমি সমাদৃত হয়েছি কয়েকবার, মুগ্ধ হয়েছি তাঁর গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহশালা দেখে। দেশে ফেরার আগে কোন বিশেষ প্রশংসা লাভের প্রত্যাশা না করে তাঁকে আমার থিসিসের একটি কপি দিয়েছিলাম। প্রায় বছর খানেক পর তিনি এক অসাধারণ সুন্দর আলোচনা লিখে পাঠিয়েছিলেন আমার তখনকার কর্মক্ষেত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তবে কোলকাতায় অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের মিশন-ক্ষেত্রে সবচে' মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন ফরাশি কন্সাল জেনারেল মসিয় বের্নার। ফোন করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁদের কাছে আমার বড় পরিচয় : প্যারিসে দীর্ঘকাল সর্বনের গবেষক ও শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাশি শিক্ষক ও আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট। তাঁর কাছে অসম্ভব সমাদর পেয়েছি আর পেয়েছি মূল্যবান উপদেশ : 'কোলকাতায় থেকে কোনো কাজ হবে না। আপনি প্যারিসে চলে যান। ইসলামাবাদে রাষ্ট্রদূতকে চিঠি লিখুন।' ইত্যাদি। লিখেছিলাম। দ্রুত জবাবও এল।

অসম্ভব সহানুভূতিশীল সেই জবাব। ফরাশি সরকারের তরফ থেকে ত্বরিত দুটি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হল : আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য। তবে আমি শর্ত দেই যে, আমি তো আর পড়াশোনা করতে যাচ্ছি না; আমাকে বাংলাদেশ মিশন সংক্রান্ত কাজ করবার অনুমতি দিতে হবে। তথাস্তু। ঘটনাচক্রে সেটি কার্যকর হলো ১৯৭৩ সালে।

ফরাশি কনসুলেটেই আমার দেখা হলো অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ড. দিলীপ মালাকারের সঙ্গে। পরে তাঁর সূত্রে চাটগাঁর গৌতম দা ও তাঁর অধ্যাপিকা স্ত্রীর সঙ্গে। প্যারিসে আমি ড. দিলীপের রান্না মাছভাত খেয়েছি এবং ডক্টরেটের মৌখিক পরীক্ষায় (সুতনঁসে) উপস্থিত থেকেছি। কোলকাতায় তাঁর বাসায় ডিনারে যাঁদের সাক্ষাৎ পাই তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ মিশনের আনোয়ারুল করিম জয়ও ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের কথা আগে বলেছি। যে ১০দিন আমার ওখানে থাকার কথা তার আগেই তিনি চলে গেলেন দক্ষিণ ভারত সফরে এবং বলে গেলেন, তিনি ফিরে আসার আগে কেউ যেন আমাকে চলে যেতে না বলে। কিন্তু এর অল্পদিন পরে আমি নিজেই অন্যত্র চলে যাবার ব্যবস্থা করি। তাই এখানে স্মরণ করি, সেই প্রতিষ্ঠানের সেই সহৃদয় মহারাজ ও অন্যান্য কর্মীদের, বিশেষ করে ক্যান্টিন-ম্যানেজার, বুলেটিন-সম্পাদক এবং রিসেপশানের গৌর মজুমদারকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালে আরেকবার আমি আমার ছোট ছেলে শাজেলসহ সে প্রতিষ্ঠানে দু'রাতের জন্য অতিথি হয়েছিলাম। তখনকার মহারাজ পরিচয় জেনে আবার আমার ভাড়া মাফ করে দিলেন। কিন্তু সেখানকার ম্যানেজারের পরামর্শে আমি কিছু অর্থ চাঁদা প্রদান করে ঋণমুক্ত হবার সামান্য প্রয়াস পাই।

১৯৭১ সালে একদা ফরিদপুরের অধিবাসী গৌর বাবুর পরামর্শ পাই, আমার স্ত্রীকে পার্ক এভিনিউতে ড. আনোয়ারা বেগমের কাছে নিয়ে যেতে।

তারপরে আসে ডেভিড কফের কথা, যিনি আমার স্ত্রী শরণার্থী এবং ক্যাম্পে আছেন শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি, তাঁর স্ত্রী, এ. আই. আই. এস-কর্মকর্তা তরুণ মিত্র, বাবুচি রহিম, আমাদের সেই দুর্দিনে যে কী পরিমাণ সহায়তা দিয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। ড. কফ মার্কিন গবেষকদের অতিথি শালার একটি কক্ষ আমাদের জন্য বিনা ভাড়ায় বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। দু-তিনদিন পর আমি মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে চলে গেলে পর্যায়ক্রমে সেখানে আমার স্ত্রীর কাছে এসে ছিলেন তাঁর পিতা ও ছোট ভাই মেহরাব।

২২.৬.১৯৭১ মঙ্গলবার

সকালে আব্বুর বাসায় (অর্থাৎ সালাম সাহেবের বাড়িতে) যাবার পথে গড়িয়াহাট ট্রাম স্টপে দেখি দাঁড়িয়ে আছে জহির রায়হান (আমার সহপাঠী, বিখ্যাত সাহিত্যিক-চলচ্চিত্রকার) ও আলমগীর কবির। ট্রামে উঠে দেখা হলো আমার দুই সহকর্মী—মোহাম্মদ আবু জাফর ও মাহবুব তালুকদার এবং তাঁদের সঙ্গে ইত্তেফাকের একজন সাংবাদিক যিনি বর্তমানে আমাদের মতো উদ্বাস্তু। পরে আব্বুর বাসায় মাহবুব ও জাফর এলেন। মাহবুব এখনো বলে যাচ্ছেন যে, আমার বাসা লুট হয়ে গেছে।[৯] অথচ বাবুল চৌধুরী (চলচ্চিত্রকার) বলেছেন, হয়নি। বাবুল চৌধুরীর নিকট আত্মীয় আমার পাশের এপার্টমেন্টে থাকেন, USIS-চট্টগ্রাম-এর পরিচালক সাইয়েদুল হক। সে-সূত্রে তাঁর তথ্য পরিবেশন। মাহবুব নাকি আমার মামা শামসুল আলম (গ্রন্থাগারিক) সাহেবের দেখা পেয়েছিলেন। তাঁর বাসাও লুট হয়ে গেছে। দুপুরে আব্বু ও জাফরের সঙ্গে পাঞ্জাবী (শিখ) রেস্তোরঁয় খেলাম। চমৎকার উপাদেয় রান্না।

তারপর সাদেক খান ও ফারুক আজিজ খান (প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিনের একান্ত সচিব)-এর সঙ্গে গেলাম এক অভিজাত হোটেলে, ভূঁইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (এই রহস্যজনক ব্যক্তি সেদিন সকালে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি বিলাত থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে এসেছিলেন, শুনেছি)। ওখানে অন্য অনেকের সঙ্গে মেজর জিয়া ও অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। পিটার হেজেলহার্স্ট-ও অন্যান্য সাংবাদিকদের দেখলাম ডাইনিংরুমে বসে থাকতে। এখানে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল। ভূঁইয়ার কামরায় এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের দুটি বিচ্ছিরি মেয়েকে দেখলাম, পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ ঘুরেছে। আবার শুনি বিশ্বভ্রমণে যাবে!

সন্ধ্যায় আব্বুর সঙ্গে বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদে গেলাম। আব্বুর বক্তৃতা 'অপূর্ব হয়েছে' বলতে শুনলাম অনেককে। পাশের সীটে দিব্যি আসীন জহির রায়হান। আমার সঙ্গে নাকি পরে একটা জরুরী কথা বলবে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নাট্যকার বিজন ভট্টচার্যকেও দেখলাম। রাখী চক্রবর্তী, সানজিদা খাতুন, দেবব্রত বিশ্বাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রের গান খুবই ভালো লেগেছিল।

---

৯ লুট না হলেও বাবা আমার জিনিসপত্র দু-তিন জায়গায় সরিয়ে রাখার কালে বেশ কিছু জিনিসপত্র খোয়া গেছে। দীর্ঘদিনের অবস্থান এবং পরিদর্শনের ফলে পশ্চিমা পৃথিবীর বহু স্থানের বহু দুর্লভ সামগ্রী, মূল্যবান বইপত্র এবং অন্তত ১০টি আমার অতি প্রিয় লং প্লে রেকর্ড দেশে ফিরে পাইনি। পরবর্তীকালে বিদেশে গিয়ে বহু খোঁজাখুজি করে মাত্র দু-তিনটি রেকর্ড কিনে আনতে পেরেছিলাম।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটিকাও মন্দ ছিল না। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন আমাদের চিত্র নায়িকা কবরী ও কোলকাতার অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়।

রামকৃষ্ণ মিশনে ফিরে এসে শুনি, শিল্পী সুনীল দাশ এসেছিল। আহা! দেখা হল না!

২৩.০৬.১৯৭১ বুধবার

২৩,২৪ও ২৫ জুন বহু জন-সংযোগ ও কর্মকাণ্ড ঘটেছে যা আমি ইংরেজিতে লিখেছি। এখানে কিছু অংশের বাংলা ভাষান্তর করলাম:

খুব কর্মব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ দিন কাটছে। সকালে আব্বু ফোন করেছিলেন। জেরার ভিরাতেল্‌ও। জেরার দিল্লীতে নিযুক্ত প্যারিসের বিখ্যাত দৈনিক ল মোঁদ্‌-এর প্রতিনিধি। একটার সময় জেরার-এর সঙ্গে লাঞ্চে যাব। আব্বুর কাছে যেতে খুব কষ্ট হল। সর্দি জ্বরে ভুগে উঠেছি সবে। আধ ঘণ্টা ধরে একটা ট্যাক্সি ধরতে চেষ্টা করছি। অবশেষে ট্রাম ভরশা। ট্রামে শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর-র সঙ্গে দেখা। ওর স্ত্রী আগরতলা এসে পৌঁছেছে শুনে খুশি হলাম। রশীদের কোনো খবর নেই (শিল্পী, চৌধুরী)। ওর বাড়ি, তাপিশ্রীগুলো সমেত লুট হয়ে গেছে মনে হয়।

১২.৩০ মিনিটে ল মোঁদ্‌ এর বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। একটা খুব ভালো কন্টিনেন্টাল লাঞ্চ সহ আলোচনা শুরু হল। পুরো ৪ ঘণ্টা ধরে চলল এই আলোচনা। বেশির ভাগ আমাকেই বলতে হচ্ছে। জেরার নোট নিচ্ছে। কমপক্ষে ৪ পৃষ্ঠা নিয়েছে।

ফেরার পথে ঘটনাচক্রে সাদেক খান ও দেবদাস চক্রবর্তীর দেখা। ট্রিনকাস রেস্তোরাঁয় তিন জন চা খেতে বসলাম। সুন্দর সঙ্গীত বেজে চলেছে। পার্ম এভিনিউতে চলে এলে এক বিতর্কে পড়ে গেলাম। বিতর্ক হচ্ছে 'বিপ্লবে বুদ্ধিজীবী ও আমলার ভূমিকা'। সাদেক ভাইয়ের বক্তব্য মনে হচ্ছে আমলার পক্ষে, কেননা তা অধিকতর ফলপ্রসূ। আমি তা মেনে নিলাম না।

আব্বু বাংলাদেশ মিশন থেকে ফিরে এলেন। আমরা একসঙ্গে চললাম সুইন হো স্ট্রীটে American Institute of Indian studies (AIIS)-এ। নিউইয়র্ক থেকে আগত International Rescue committee-র সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন :

Ambassador Angier Biddle Duke
Mr. Morton Hamburg,
Mrs. Lee Thaw

Dr. Daniel L. Wadner. And
Mr. Thomas w. Phipps

বহু আলোচনা– যার সারমর্ম দাঁড়াল : তাঁরা মাসে দশ হাজার ডলার আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে নগদ এক হাজার ডলার প্রদান করেন। এই অর্থ দিয়ে সাতটি ক্যাম্প স্কুলে কাজ শুরু হবে। সেখানে উপস্থিত আমেরিকার এক লেখককে আমি কথা দিয়েছিলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা কী ভাবে এখানে এলাম তার বিবরণ লিখে পাঠাবো। [তা পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি জবাবে জানিয়েছিলেন যে, আমার লেখাটি তাঁদের চাঁদা সংগ্রহে খুবই সহায়ক হয়েছে]।

শেষের দিকে দীর্ঘক্ষণ যাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম তিনি যে ডেভিড কফ, তা বুঝতে পারিনি। অথচ ক'দিন ধরে তাঁর বই পড়ে আমি মুগ্ধ ছিলাম। তিনি আমার থিসিসের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। কেননা তাঁর থিসিসে বাংলার নব জাগরণে মূলত হিন্দু ভূমিকা আর আমারটাতে প্রধানত মুসলমানদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তিনি পরদিন আমাকে ডিনারের দাওয়াত দিলেন।

২৫.৬.১৯৭১ শুক্রবার জেরার ভিরাতেল সন্ধ্যাবেলা এলেন আমার কাছে। আমরা আবার আলোচনায় বসলাম। আর তিনি নোট নিতে থাকলেন। পরে তাঁকে নিয়ে আমি আব্বুর বাসায় চললাম। জেরার আব্বু, ব্যারিস্টার সালাম, সাদেক, ফারুক আজিজ, আব্দুল্লাহ, মতিলাল প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁদের সবাইকে আলোচনায় রেখে আমি ডেভিড কফের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমরা নানা বিষয়ে মত বিনিময় করতে থাকলাম, বিশেষ করে বাংলার নবজাগরণ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হল। শেষ পর্যায়ে একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ডেভিড আমাকে তিনটি প্রস্তাব করলেন :

* আমার স্ত্রীকে আগরতলা থেকে এনে এখানে তাঁদের কাছে রাখতে পারি। সকালে ব্রেকফাস্ট এবং রাত্রে তাঁদের সঙ্গে আহার করা যাবে। দুপুরে তাঁরা থাকেন না। বউ-বাচ্চা সহ সবাই বাইরে।

* আমার অভিসন্দর্ভের ইংরেজি অনুবাদের জন্য ফান্ড সংগ্রহের চেষ্টা করবেন।

* আমেরিকায় গিয়ে আমি শিক্ষকতার কাজে যোগ দিতে পারি কিনা তাও তিনি দেখবেন।

অবাক কাণ্ড! একেই কি বলে 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'! ডেভিড কি সে রাত্রে একটু অতিমাত্রায় পানীয় গ্রহণ করেছিল? একেবারে অবিশ্বাস্য সব প্রস্তাব!

২৬.০৬.১৯৭১ শনিবার

বহুদূর হেঁটে আগরতলায় অবস্থানরত স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করলাম–যত শীগগির সম্ভব কলকাতায় চলে আসতে। অবশেষে ওর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

৪.০৭.১৯৭১ রোববার

(মাঝখানে কিছু লেখা নেই। স্মৃতিও অসহযোগ ঘোষণা করেছে। আবার ইংরেজিতে পাওয়া গেল এক পৃষ্ঠা। তাই বাংলায় লিখি :)

খুব সকালে এলেন প্রখ্যাত লেখক মনোজ বসু। পরিচ্ছন্ন, কিন্তু দাঁড়ি কামানো হয়নি। কোন পূর্ব পরিচিতিহীন, অথচ তিনি আমাকে প্রায় জোর করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ি। দয়ালু হৃদয়ের মানুষটি তাঁর খুব উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মার্কিন মূলুকে ইথাকা থেকে প্রকৌশল বিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সেখানে বাংলার অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নিজেও একজন লেখক এবং বেঙ্গল পাবলিশার্সের পরিচালক। মনোজ বসুর বাড়িটি খুবই সুন্দর। তাঁর স্টাডিটি অপূর্ব। বাইরের দৃশ্য মনোরম, কোলকাতায় এরকম দেখাই যায় না। অবশ্য এটা আমার ধারণা, যা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। মনোজ বাবু আমাকে এক বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে জহির রায়হান ও আলমগীর কবির রয়েছেন। এবার আলমগীরের সাথে যথার্থভাবে পরিচিত হলাম। সিনেমা সম্পর্কে অল্প আলোচনা করে ১১ টার কিছু পর মনোজ বাবু আমাকে রামকৃষ্ণ মিশনে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

আগরতলা থেকে ভায়রা মাসুদ ভাইয়ের টেলিগ্রাম পেলাম : নাসরিন ৮ তারিখ কোলকাতা পৌঁছুবে। শ্যালক মেহরাবকে টেলিগ্রাম পাঠালাম সে যেন তার আপার সঙ্গে আসে এবং সে মর্মে রিজারভেশন করে।

আব্বুর বাসায় গিয়ে দেখি, এক হিন্দিভাষী অধ্যাপককে তিনি বাংলাদেশ বিষয়ে বই লেখার জন্য উপকরণ দিচ্ছেন। এরপর তাঁর সঙ্গে গ্র্যান্ড হোটেলে ব্রিটিশ এম.পি.জন স্টোনহাউস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। বাংলাদেশ সম্পর্কে স্টোনহাউসের সহানুভূতি প্রবাদসদৃশ। আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎকার টেপ রেকর্ডারে বাণীবদ্ধ করলেন তিনি।

৫.৭.১৯৭১ সোমবার

দুঃসহ প্রতীক্ষা!

৮.৭.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

আব্বু আর আমি বিকাল থেকে দমদম বিমানবন্দরে নাসরীনের জন্য অপেক্ষা করছি। বিমান থেকে নেমে বাবার বুকে মুখ রেখে হু হু করে কাঁদতে লাগল। আমি তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপর সরাসরি পার্কস্ট্রীটের একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে নৈশভোজন সেরে নিলাম। [নাসরীন আমাদের জানাল যে, বিমানে তার সহযাত্রি ছিল চার খলিফারূপে পরিচিত ছাত্রনেতারা]। পাম এভিনিউতে আব্বুকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে সুইনহো স্ট্রীটে আমাদের নতুন ঠিকানায় চলে এলাম। ডেভিড কফ ও তাঁর স্ত্রীর সেদিনের অভ্যর্থনা মনে রাখবার মত।

১১.৭.১৯৭১ রোববার

সকালে আব্বু ফোন করে জানালেন, আমি যেন তিনটার দিকে বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষীর সাথে সাক্ষাৎ করি। নাসরীনকে তাঁর কাছে রেখে আমি গেলাম মিশনে। চাষীর সাথে মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ নামে ফরিদপুরের একজন জাতীয় সংসদ সদস্যও ছিলেন। দু'জন সাধারণ কথাবার্তার ঢঙে আমাকে নানা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। পরে জানালেন যে, একদিন পর অর্থাৎ ১৩ তারিখ আমাকে মধ্য-প্রাচ্যের পথে দিল্লি যেতে হবে। তথাস্তু।

১২.৭.১৯৭১ সোমবার

ভর দুপুরে অন্নদাশংকর ও লীলা রায়ের মেয়ে (তৃপ্তি) এসে দরজায় করাঘাত করলেন। মা পাঠিয়েছেন। নাসরীনকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাংলাদেশ মিশনের বিপরীতে এক মহিলা গাইনি ডাক্তারের ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন ডাক্তার।

পরে পার্কস্ট্রীটের স্টুডিও অরিয়েন্টে গিয়ে দু'জনে একটি ছবি তুললাম।

১৩.৭.১৯৭১ মঙ্গলবার

সকাল থেকে নানা কাজকর্ম সেরে, চিঠিপত্র লিখে প্রস্তুত হতে থাকলাম। বিকেল ৫টার দিকে বাংলাদেশ মিশনে উপস্থিত হলাম। সেখানে নতুন করে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলো সর্বজনাব এম.আর.সিদ্দিকী, মোল্লা জালাল ও কে.এম.শেহাবউদ্দিনের সঙ্গে। আনোয়ারুল করিম জয় কিছু কাগজপত্র হাতে দিলেন, আমার পরিচিতি-পত্রে 'প্রতিনিধি দলের সদস্য' কথাটা উল্লেখিত ছিল। কোন পয়সাকড়ি দেওয়া হলো না। বলা হলো, দিল্লীতে পাওয়া যাবে। সম্ভবত রাত ১০টার দিকে আমরা দিল্লী বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম।

দিল্লী পর্ব

১৩.৭.১৯৭১ মঙ্গলবার

দিল্লী পৌঁছে সবাই চললাম শেহাবুদ্দিনের বাসায়।[১০] সেখানে আমজাদুল হকের সঙ্গে দেখা। সেই কবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ইস্ট হাউসে আমরা পাশাপাশি কামরায় থাকতাম, সম্ভবত '৫৭-৫৮ সালে। হক পাকিস্তান দূতাবাসে তথ্য বিভাগে কর্মরত ছিলেন। কিছুদিন হলো তিনি আমাদের পক্ষে চলে এসেছেন। তিনি অকৃতদার। আমি তাঁর ছোট ফ্লাটে আশ্রয় পেলাম। সেটি খুবই কাছে। তার আগে শেহাবুদ্দিনের বাসায় ডিনার খেলাম। মিসেস শেহাবুদ্দিন চট্টগ্রামের পটিয়ার মেয়ে, আমার স্কুলজীবনের সহপাঠী খান শফিকুল মান্নানের ভাইঝি। দু'নেতা সেরাত্রে এই দম্পতির তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

[এরপর ১৪,১৫,১৬ জুলাই তারিখে কিছু লিখিনি। যতদূর মনে আছে, ১৪ তারিখ সকালে আমরা ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে সচিবসহ বহু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচিত হই। পরদিন পার্লামেন্টে যাই। স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এবং কিছুক্ষণ সংসদের একটা অধিবেশন দেখলাম]।

১৭.৭.১৯৭১ শনিবার

আজ সকালে দিল্লীর ফরাশি দূতাবাসে ফোন করে পেলাম মসিয় বুফোঁদ্যো-কে। সাত মিনিটে তিনি হোটেলে চলে আসলেন। বছর ত্রিশের জোয়ান ফরাশি-বুদ্ধিমান ও সহানুভূতিশীল। অনেক আলাপ হলো। বাকী আগামীকাল সকালে।

বিকেলে নেতৃবর্গের সাথে গেলাম মি. সোয়েলের বাসভবনে। ভদ্রলোক বোধহয় লোকসভায় নাগা প্রতিনিধি এবং ডেপুটি স্পিকার। খুবই ধীমান। সোজাসুজি কথাবার্তা বলেন। আমাদের জন্য তাঁর প্রচুর সহানুভূতি, তবে আবেগপ্রবণ নন আদৌ।

তার আগে আমরা গিয়েছিলাম জয়প্রকাশ নারায়ণের বাংলাদেশ কনফারেন্স অফিসে। অনেক আলোচনা। আমি কিছু লিখিত সাজেশন দিলাম। গৃহীতও হলো। আর দাওয়াতপত্র পাঠানোর জন্য কতকগুলো নাম প্রস্তাব করলাম :

---

[১০] সাবেক পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের (পি. এফ. এস.) প্রথম কর্মকর্তা যিনি দিল্লী দূতাবাস থেকে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। গত বছর তাঁর ইন্তেকালে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী ও ঢাকার ইনকিলাবে আমি প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

- জিল ফিলিবের- প্যারিসে বাংলার অধ্যাপক
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ- সাহিত্যিক, ইউনেস্কোতে কর্মরত
- জঁ-পল সার্ত্র– প্যারিস ১৯৬৪ সালে নবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানকারী দার্শনিক ও সাহিত্যিক।
- সিমন দ্য বোভোয়ার - সার্ত্রের সহপাঠী ও জীবনসঙ্গী
- বনি ক্রাউন- অনুবাদক, নিউইয়র্ক
- ডিমক- অধ্যাপক, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়
- ডেভিড কফ- ইতিহাসবিদ, কোলকাতা
- ফাদার ফালোঁ- ফরাশি অধ্যাপক, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম- কোলকাতা
- হাসনায়েন হায়কল- সম্পাদক, আল আহরাম, কায়রো
- দুশন জ্ভাবিতেল-বাংলার অধ্যাপক, প্রাগ

সন্ধ্যায় অশোক মিত্রের বাসায়। তিনি ভারত সরকারের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা। তিনি নাকি প্যারিসে আমার বই দেখেছেন (নিঃসন্দেহে ফ্রঁস ভট্টচার্যের কাছে)। ওখানে সাংবাদিক সুভাষ চক্রবর্তী (সম্প্রতি বিদেশ ফেরত) ও আরো দু'জন কবি-শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। ড. রেহমান সোবহানের সঙ্গেও দেখা হলো। ইতিপূর্বে এম.আর.সিদ্দিকীর সঙ্গে এসে তিনি একবার ইমপেরিয়েল হোটেলে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করেছিলেন। প্যারিসে যাচ্ছেন শুনে তখন আমি তাঁকে যোগাযোগের জন্য কয়েকটি নাম-ঠিকানা দিই।

১৮.৭.৭১ রোববার

সকাল সাড়ে দশটায় বুফোঁদ্যো এলেন। নতুন করে পুরোনো ঘটনাবলীর ওপর আলোচনা চলল। ফরাশি সরকারের উচ্চতর মহলের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগের একটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। বিকেলে ওঁর সঙ্গে গেলাম সুভাষ চক্রবর্তীর বাসায়। সেখানে দেখলাম, নীরদ চৌধুরীর 'বাঙালী জীবনে রমণী' ও অন্যান্য বহু বই যা পড়ার লোভ হলো। সন্ধ্যায় গেলাম ফরাশি সংবাদসংস্থা এ.এফ.পি-র প্রতিনিধি জঁ ভ্যাঁসঁ-র বাসভবনে। ভালোই কাটল প্রীতিপূর্ণ সান্ধ্যসভা। বাংলাদেশ সম্পর্কে সহানুভূতি সবার মনে কিছু ছিল, আরো কিছু জাগাতে পেরেছি, মনে হলো। কিন্তু গৃহকর্তা মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকার ফলে ওর সঙ্গে আলোচনা খুব জমলো না। দক্ষিণ ভারতীয় সাংবাদিক মোহন রামকে খুবই সহানুভূতিশীল পেলাম।

১৯.৭.১৯৭১ সোমবার

[সকালে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' (পুনা/ নিউ দিল্লী) পত্রিকায় প্রকাশিত জয়প্রকাশ নারায়ণের একটি বিবৃতি ইংরেজিতে লিখে রেখেছি। এখানে অনুবাদ করে দিই] :

'বিদেশ নীতির ব্যাপারে কোন দেশ পুরো পরোপকারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করে না, এটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে। টিকে থাকা এবং স্বার্থপর লক্ষ্য স্বভাবত অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।... (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে) নয়া দিল্লীকে চিরাচরিত ও আমলাতান্ত্রিক বিদেশ নীতি পরিহার করে বেগবান, প্রগতিশীল ও প্রভাবশালী নীতি চালু করতে হবে।কেউ আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়িয়ে দেবে না যদি আমরা নিজেরা বাংলাদেশ ইস্যুতে নিজেদের পায়ের ওপর না দাঁড়াই।'

বিকেলে সদলবলে কুতুব মিনার, হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর দরগাহ, নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ, আমির খসরু ও জাহানারার মাজার পরিদর্শন করে হোটেলে ফিরলাম।

[তখনও আমরা থাকতাম ইমপেরিয়াল হোটেলে এবং আমাদের সঙ্গে ছিল একটি সার্বক্ষণিক গাড়ি]।

২০.৭.১৯৭১ মঙ্গলবার

বিকেলে ড. লোকনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাহিত্য একাডেমিতে সাক্ষাৎ হলো। দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর আমাকে হোটেলে রেখে তিনি চলে গেলেন। (আগরতলা থেকে আমি তাঁর কাছে চিঠি লিখি। অবশ্য চোখের অসুখের কারণে জবাব দেন তাঁর স্ত্রী মাদাম ফ্রঁস ভট্টাচার্য। তিনি আমার পূর্ব পরিচিতা ফরাশিনী। ইতিমধ্যে তাঁরা দু'জন প্যারিসে গিয়েছিলেন এবং আমার প্রকাশকের কাছে প্রদত্ত তালিকা মোতাবেক এক কপি বই সৌজন্য স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। বইটি সম্পর্কে লোকনাথ দা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন)।

অতঃপর আমার দুই সিনিয়র সহকর্মীর সঙ্গে 'কালচক্র'-এর দুটি একাংক নাটিকা 'দুই বিঘা জমি' এবং 'বাংলার মুখ' দেখতে গেলাম। মন্দ নয়। শেষেরটি আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ওপর এবং খুবই মর্মস্পর্শী।

দিল্লীতে বাংলার অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র দাশগুপ্ত[১১] এবং অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলো। তাঁদের অনুরোধ, আমাদের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। আপাতত স্টেজে উঠতে হলো–দর্শকদের চেহারা দেখানোর জন্য।

---

[১১] "এখানে ভারতীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাস করতেন ১৮৬৮-১৮৭০ সালে।"-এই ধরনের একটি ইস্পাতের স্মৃতি-স্মারক ফলক নিয়ে দিল্লী থেকে প্যারিসে এসেছিলেন

২১.৭.১৯৭১ বুধবার

সকাল সাড়ে দশটায় গেলাম আলফ্রেড ভাজ[১২]-এর অফিসে। রঘুনাথমের সঙ্গে নিহত, অত্যাচারিতদের সম্পর্কে আলাপ। ভাজের অফিসে আমাদের নেপাল গমনকারী দল রয়ে গেলেন।[১৩]

দেখা গেল, এখানে আমরা তিনজন–মিস্টার দত্ত (এম, আর.সিদ্দিকীর ছদ্ম নাম, মিস্টার চৌধুরী (মোল্লা জালাল) এবং মি.সেন (আমি) অহেতুক এলাম।

দুপুরে মি.এস.এম ঘোষের বাসায় মধ্যাহ্নভোজ। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভাগ্নে অশোক বসুর সঙ্গে আলাপ জমলো। চমৎকার সব বাঙালি ব্যঞ্জন আর মাছ–রুই, ইলিশ, মাগুর ও আর একটি মাছ, পোনাটোনা কিছু হবে। এখানে আমরা এসেছিলাম সিদ্দিকী সাহেবের অনুগ্রহে। তাঁর কাছে শুনেছি, ঘোষ মশাই একদা অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। এখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বাসভাজন ও একজন পরামর্শদাতা। দত্তবাবুকে পালাম এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়ে,[১৪] পাসপোর্ট ছবি ও চশমার অর্ডার দিয়ে, নতুন কামরায় ফিরলাম।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার সাংবাদিক দিলীপ মুখার্জি এলেন। পরে মালেক সাহেব ও মমিন তালুকদার। অনেকক্ষণ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা হলো। একটা অজানা তথ্য জানলাম : ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান) নাকি ত্রিশ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছিল পাকিস্তানকে। তাছাড়া সেবার উন্নয়ন খাতের তেতাল্লিশ কোটি

অধ্যাপক দাশগুপ্ত। ভারতীয় দূতাবাসের প্রেস-এটাচি পুষ্প দাশ ভের্সাইর মেয়রের অফিসে এক অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এর রিপোর্ট আমি ঢাকায় পাঠালে আমার ছোটভাই আকবর শাহ কোরেশী তা দৈনিক সংবাদে প্রকাশ করে (১৯৬৮)। তাছাড়া '৮০-র দশকে কোলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন রবীন্দ্র বাবুর সাথে আমার একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘটে।

[১২] আলফ্রেড ভাজ-সম্ভবত গোয়ার খ্রিস্টান। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল অফিসার। ফরাশি বলতে পারার জন্য আমার সঙ্গে একটু বেশি খাতির ছিল।

[১৩] এই দলের নেতা আব্দুল মালেক উকিল। অন্যান্যদের মধ্যে সুবোধ মজুমদার ও আমাদের সময়ের ছাত্রনেতা মোমিন তালুকদারের নাম মনে পড়ে।

[১৪] দত্তবাবু তথা এম.আর সিদ্দিকীকে মুজিবনগরে ডেকে পাঠিয়ে জানানো হলো যে, দূর-প্রাচ্যর বদলে তাঁকে আমেরিকায় যেতে হবে। আমি তাঁর হাতে অধ্যাপক আহসানের জন্য চিঠি দিলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সময়ে তিনি কনট সার্কাসে পুরোনো বই কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং আমার সাহায্য চাইলেন। তিনি ভারতে একজন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অভিজ্ঞতার কাহিনী এবং অঁদ্রে মাল্‌রোর 'এন্টি-মেমোয়ার্স' কিনে নিলেন। সম্ভবত মোল্লা জালালও সেবার একটি ফরাশি উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ক্রয় করেন।

টাকাও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি (আহারে, কী দিলদরাজ বন্ধুত্ব)! পরে কনট সার্কাসের পার্কে ফোয়ারার সামনে বসলাম সবাই।

[২২, ২৩ জুলাইয়ে কোন লেখা নেই।]

২৪.৭.১৯৭১ শনিবার

জে.জে.সিং-এর বাড়িতে চায়ের দাওয়াত। ভদ্রলোক তেত্রিশ বছর মার্কিন-মুলুকে ছিলেন। ব্যবসা ও রাজনীতি দুটোই করেছেন। সেই সুবাদে এখনো দিব্যি চলছেন। প্রাসাদোপম বাড়ি। ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রী নাকি তাঁর কথা শোনেন। সহানুভূতিশীল। উদার ব্যক্তি।

এর মধ্যে পরিচয় হলো এক ফরাশি গবেষকের সঙ্গে। তাঁর গবেষণার বিষয় কিছুটা অস্পষ্ট মনে হলো। তাঁর নাম জঁ-ক্লোদ এলালুফ। বাংলাদেশ কিংবা ভারতীয় রাজনীতির ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত। প্যারিসে বাংলাদেশ আন্দোলন কিভাবে চালানো যায় সে ব্যাপারে খুব চমৎকার বাস্তবভিত্তিক কিছু সাজেশান দিলেন :

- বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে এমন সব লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে।
- বাংলাদেশ বায়াফ্রা নয়।
- জনমতকে মানবিক/রাজনৈতিক দিকে মোড় ফেরানো।
- বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযুক্ত গণ-অভিপ্রায় সৃষ্টির প্রয়াস।
- যেখানে-সেখানে বক্তৃতা করে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই।
- যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে ইউ.ডি.আর.-(ইউ.জি.পাঁচ)তাদের নেতা এদগার ফোর, ভালোঁ প্রমুখ পার্লামেন্টারি সদস্যের সঙ্গে।
- সংগ্রামী মুক্তমনারা যেমন, সোশালিস্ট পার্টির আলাঁ সাভরি, জে.জে.এস.এস, ফ্রঁসোয়া মিতের; পি.এস.ইউ-র মিশেল রকার; পিসির-জর্জ মার্শে প্রমুখ,
- বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী রনে অঁদ্রিয়েন-*লুমানিতে*,
- মিশেল লেরিস (আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ, ম্যুজেদ্যলম,)
- মোরিস দ্যুবেরজে (আইনের অধ্যাপক)
- দানিয়েল থর্নে (অধ্যাপক)
- মোরিস ক্লাবেল *(নুবেল অবসেরভাতর) এবং*
- অঁদ্রে মাল্‌রো-এর সঙ্গে যোগাযোগ।

- এলালুফের কাছ থেকে আরো সাজেশান মিলবে। কোলকাতা ফিরে যাবার সময় বা অক্টোবরে প্যারিসে যাবার পথে।

২৫.৭.১৯৭১ রোববার

আজ সারাদিন ঘরে বসে কাটলো। কিছু টুকটাক কাজ করা হলো। সন্ধ্যায় অমরেশ সেনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হলো। ভদ্রলোক নিজে গাড়ি নিয়ে এলেন। মিসেস সেন 'মুসলিম রাজনীতি, বাংলাদেশে ১৯৩৭-১৯৪৭' বিষয়ে কাজ করছেন। তাঁকে কিছু তথ্য সরবরাহ করলাম। সঙ্গে বইপত্র না থাকাতে সব জানানো গেল না। ফিরতি পথে হয়তো সময় করে তা করা যাবে।

২৬.৭.১৯৭১ সোমবার

প্রাতঃরাশের পর বের হবার কথা ছিল। শেষাবধি যেতে হলো না। হঠাৎ মনে পড়লো বুফোঁদ্যো হয়তো ফিরতে পারেন কোলকাতা থেকে। ফোন করলাম। দুপুরে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে এলেন। এ সময়ে হাজির হলেন ফকির শাহাবুদ্দিন।[১৫] [তিনিও আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে শরীক হলেন]।

বুফোঁদ্যো বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন। তবে তাঁকে খুব মানসিক দ্বন্দ্বে পীড়িত মনে হলো। আগামীকাল মওদুদ (ব্যারিস্টার) প্রদত্ত বার্মার বাঙালি শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কিত চিঠির কপি দিয়ে যাবেন।

দুপুরে বিশ্রাম। গড়াগড়ি। সন্ধ্যায় জনপথ ধরে কনট সার্কাসে। দর্জির কাছ থেকে কাপড় নেওয়া হলো এবং কিছু খুচরো বাজার করা গেল। ভাগ্যিস, সকাল বেলা টাকাটা পাওয়া গিয়েছিল।

শোনা গেল, আগামীকাল আমাদের যেতে হবে। রাত্রে তাই অর্ধ-সমাপ্ত চিঠিগুলো শেষ করে ফেললাম। কাল সব ডাকে দিতে হবে। এলালুফকে ফোন করলাম। কাল তিনটায় আমার থিসিসটা নিয়ে আসবে। তার নাকি খুব ভালো লেগেছে। কোনো কোনো অংশ দু'তিনবার পড়েছে। অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। কাজে কাজে খুবই 'ফ্ল্যাটার্ড'।

---

[১৫] তিনি এম.আর.সিদ্দিকীর বদলে দূর-প্রাচ্যে যাবেন। সঙ্গে থাকবে জ্যোতিপাল মহাথের মহোদয়। স্বাধীন বাংলাদেশে এটর্নি জেনারেল ফকির শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আমার কিছু যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া ১৯৯০ সালে মহাথের একবার বাংলা একাডেমিতে ডি. জি. থাকাকালীন আমাকে এসে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী উপহার দিয়ে যান।

২৭.৭.১৯৭১ মঙ্গলবার

কী জানি কেন রাত্রে এক ফোঁটা ঘুমও হলো না! আসন্ন বিদেশ যাত্রার উত্তেজনা কিংবা দেশের মর্মান্তিক পরিস্থিতির ভাবনা হয়তো তার জন্য দায়ী। সকাল বেলা বেরোনোর কথা। সেজেগুজে বসে রইলাম। কিন্তু সিদ্দিকী সাহেব গাড়ি নিয়ে গেছেন, ফিরলেন না। তিনি ফিরে এলে সবাই একসঙ্গে চীনা খাবার দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করলাম। রসিকতাপূর্ণ পরিবেশ। খাওয়া শেষ হতেই ঠিক হল : শেহাবুদ্দিনের বাসায় যাব। ঠিক এই মুহূর্তে এলালুফ এল। কিন্তু বই নিয়ে আসেনি। পরে আসার কথা। এলোই না, আশ্চর্য।

শেহাবুদ্দিনের বাসায় মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে দেখা- মোটামুটি সব বলা এবং শোনাও হলো। সন্ধ্যার সময় হোটেল জনপদ থেকে মালেক সাহেবরা সবাই এলেন। ফকির শাহাবুদ্দিন তো আছেনই। সস্ত্রীক অমরেশ সেন এলেন। সবার শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা দু'জন যাত্রার জন্য প্রস্তুত। শেষ মুহূর্তে মেহেরা এলেন টিকেট নিয়ে, প্রায় আটটার সময়।

লেবাননে মুক্তিযুদ্ধের মিশন
বৈরুত : প্রথম পর্ব

২৭.৭.১৯৭১ মঙ্গলবার

(দিল্লী থেকে রাত) সাড়ে দশটার দিকে প্লেনে উঠলাম)।

[মোল্লা জালাল ও আমি। মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত দুই সদস্য-বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল। গন্তব্য বৈরুত]।

(শুরু হল) দীর্ঘ রজনীর যাত্রা! যথাসময়ে বম্বে পৌঁছলাম। বম্বে থেকে রাত দেড়টায় আসল যাত্রা। দিল্লী-বম্বের পথে যখন নৈশভোজ পরিবেশিত হচ্ছিল তখন মিসেস থ' এসে পাশে বসলেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় গ্র্যান্ড হোটেলে একটি বুদ্ধিজীবী সহায়তা কমিটির আলোচনা-সভায় পরিচয় ঘটেছিল। তিনি বললেন, তাঁর পাশে বসেছে এক নিগ্রো। তাঁর সন্দেহ, ও ড্রাগ খেয়ে নিজে নিজে বকর-বকর করছে। হঠাৎ তাঁর মানহানি করতে পারে। তাই পরিচিত জনের পাশে বসা। এবার আমাদের দু'জনের কিচির-মিচির। প্রায় সবই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। International Rescue Committee-র তরফ থেকে কলকাতায় তিনি আমাদের জন্য কিছু কাজ করছিলেন। গ্র্যান্ড হোটেলের বিশেষ সুইটে ছিলেন। খুবই সহানুভূতিশীল।

আমাদের বহনকারী জাম্বো বিমান 'সাজাহান' সত্যি বিশাল ও আরামপ্রদ। আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণে সজ্জিত। সুরুচিপূর্ণ। বম্বে থেকে রাত দেড়টায় রওনা দিয়ে ভোর পাঁচটার দিকে পৌঁছলাম বৈরুত। সেখানে তখন রাত আড়াইটা। বিমান-বন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মি.নন্দ। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাইপার এসিসটেন্ট। স্বল্পভাষী, মাঝারি আকৃতির মানুষটি আমাদের নিয়ে গেলেন পাম-বীচ হোটেলে। পাশাপাশি দুটি সুইটে আমরা খুবই ভ্রমণক্লান্ত-কয়েকঘণ্টার জন্য গভীর নিদ্রামগ্ন থাকলাম। সকাল সাড়ে এগারোটায় মি.নন্দ আবার এলেন এবং আমাদের নিয়ে গেলেন ভারতীয় দূতাবাসে। সরাসরি রাষ্ট্রদূতের খাস কামরায়। (এই যেতে- আসতে কিংবা যতক্ষণ আমরা এই কক্ষে থাকি তখন অন্য কেউ সেখানে উপস্থিত হতেন না। শেষের দিকে দু'একজন বিশেষ প্রয়োজনে বা তাঁর আহবানে হয়তো আসতেন)।

রাষ্ট্রদূত এ.কে.দার– অবতার কৃষ্ণ দার, মিসেস বিজয়-লক্ষ্মী পন্ডিতের মেয়ে-জামাই, এক্স-ব্রিগেডিয়ার, খুব চমৎকার লোক, দিল দরিয়া, হাসিখুশি। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই পাকিস্তানী–তাদের কিংবা স্বদেশি 'সোকল্ড সোসিয়ালিস্টস্', ব্যুরোক্র্যাটসদের সমানে গালাগাল দিয়ে চলেছেন 'সালা' 'বানচৎ', 'হারামি কি বাচ্চা'...আরো কত কিছু। কিন্তু মনে হয়– একটা মহৎ উদ্দেশ্যে, যুক্তিপূর্ণ তর্ক-বিতর্কের স্তরে উন্নীত হবার প্রত্যাশায় কিংবা বাস্তবমুখী সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার লক্ষ্যেই এসব অভদ্র শব্দ- ব্যবহার। এভাবে বারোটা থেকে দু'টা অবধি। এবার তিনি তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে আমাদের হোটেলে নামিয়ে নিজের বাসায় চলে গেলেন।

সন্ধ্যায় আমাদের হোটেলে এসে নিয়ে চললেন দৈনিক *আল-ইয়োম* পত্রিকার সম্পাদক-সকাশে। সম্পাদক তৌফিক তিব্বি (Wafic Tibbi)-র সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা আলোচনা চলল। আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁকে খুবই সহানুভূতিশীল দেখা গেল। তবে ঘটনাবলীর বিবর্তনের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। তাঁর মতে, আরবজগতে আমাদের প্রচারকার্য চালাতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। বিশেষত সরাসরি সম্পাদকদের কাছে আমাদের অভিমত যুক্তি সহকারে তুলে ধরা। প্রয়োজনমত নিয়মিতভাবে তাঁদের তথ্যাদি সরবরাহ করা। তাই আমরা শুরু করলাম তিব্বিকে দিয়ে। তাঁকে পাঁচ-ছ'টি পুস্তিকা দিলাম। সম্পাদকদের মধ্যে তিনি বিশেষ করে *আন-নাহার* পত্রিকার সম্পাদকের কথা বললেন। আমি ফরাশি দৈনিক *ল অরিয়ঁ*-র কথা বলাতে তিনি সেটির নামও বললেন। তবে *আন্-নাহারের* অসম্ভব প্রভাবের কথা বললেন। একটু প্রতিক্রিয়াশীল হলেও ভীষণ পপুলার। আমাদের এককালের দৈনিক *আজাদ* নাকি? তিনি ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা চালাতে বললেন। শুক্রবার আমাদের জন্য রাষ্ট্রদূতের কাছে একটি তালিকা পাঠাবেন। সে তালিকায় যে-সব ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন তাঁদের নাম-ঠিকানা থাকবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে তিনি বিশেষ করে সোসালিস্ট প্রগ্রেসিভ পার্টির নেতা কামাল জুমলাতের কথা বললেন– যাঁর নাম শীর্ষে থাকবে।

২৯.৭.৭১ বৃহস্পতিবার

সকাল ১০ টায় আমরা পৌঁছে গেলাম ড.ওমর আবু রিশের বাসায়। আবু রিশ সিরীয়, আরব জগতের খুবই নামকরা কবি। এক সময়ে ভারতে রাষ্টদূত ছিলেন। অন্য কয়েকটি দেশেও ছিলেন। গতকাল *আন-নাহার* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর নতুন বইয়ের খবর দিতে গিয়ে ছবি সহ বক্স হেডিং ছিল। কপিটা যোগাড় করা দরকার হবে। খাজুরাও-র ওপর এক মহাকাব্য লিখেছেন তিনি। ফ্রান্সে অনুবাদ

হয়েছে। কেউ একজন তাঁকে লিখেছেন, টেলিভিশনে মিউজিক্যাল করিওগ্রাফিতে তাঁর কাব্যকে রূপায়িত করবার প্রস্তাব দিয়ে। তাঁকে আমার থিসিস ও বাংলাদেশের কবিতা পাঠাতে হবে। ইসকান্দার মির্জা, সোহরাওয়ার্দী, ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে তাঁর আরব নীতি সম্পর্কে আলাপের স্মৃতি তিনি এখনও বহন করছেন। বাঙালিদের সম্পর্কে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে কলকাতায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। একজন প্রভূত সম্পদশালী রিফিউজী, লেবানীজ একাডেমীর সদস্য তিনি। তাঁর পড়ার ঘর– যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেটা এক অসাধারণ কক্ষ, এত সুন্দর স্টাডি আমি আর কোথাও দেখিনি। ৪ বা ৬ আগস্ট লেবানীজ একাডেমীর পক্ষ থেকে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা লেবানীজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেখানে তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে– বাংলাদেশ সমস্যা। সিরিয়ার একজন পার্লামেন্ট সদস্য ও মিশরের বিখ্যাত সম্পাদক হাসনায়েন হায়কেলের কাছে তিনি আমাদের জন্য চিঠি দেবেন– অবশ্য আমরা যদি ওদিকে যাই।

বিকেলে আমরা ওমর আবু রিশের বন্ধু মোহাম্মদ আলী হিমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বিখ্যাত *আন-নাহারের* ডিরেক্টর, একজন দ্রুজ মুসলমান, সাম্যবাদবিরোধী। তিনি পিয়ের এদে (*ল'রিয়ঁ লজুর*, ফরাশি দৈনিকের সম্পাদক, *আন্-নাহারের* অন্যতম কর্তৃপক্ষ, প্রভাবশালী নেতা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ছেলে, প্রো-ইন্ডিয়ান, প্রো-আমেরিকান)-র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন। তাঁকে কিছু তথ্যপুস্তক দিতে হবে। আগস্ট ৪, বুধবার সাড়ে ৫টায় আবার দেখা করতে যাব। খুবই সহানুভূতিশীল। অন্য দুজনের চাইতেও বেশি কিছু বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেন– লেবাননে থেকে কীভাবে আরব জগতে আমাদের প্রচার কার্য চালানো যায় এবং তার প্রভাব অনুভূত করানো যায়, সে বিষয়ে। তাছাড়া *আল-আহরামের* কার্যকর সম্পাদক ক্লভিস মকসুদের কাছে আমাদের পরিচিতি-পত্র দেবেন।

৩০.০৭.৭১ শুক্রবার

[ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসায়]

সন্ধ্যায় মোহাম্মদ মোস্তফার কাছ থেকে করাচী-ইসলামাবাদ ও কোয়েটায় অবস্থানরত বাঙালিদের খবর পাওয়া গেল। নিদারুণ নির্যাতন চলছে বাঙালিদের ওপর। বাগদাদ ও বৈরুতে যে বাঙালি ক'জন আছেন বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কিছুটা জানা গেল। এখন প্রশ্ন এঁদের রাজনৈতিক আশ্রয় কে দেবে? মোস্তফা একটা তালিকা প্রস্তুত করে দেবেন আগামীকাল।

এরমধ্যে রাষ্ট্রদূত দারের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে কয়েকবার। বারবার মুগ্ধ হচ্ছি তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কূটনৈতিক কথাবার্তার কায়দা-কানুন দেখে। তাঁর সঙ্গে ইংরেজি বা হিন্দীর চাইতে আমার বেশির ভাগ আলাপ হচ্ছে ফরাশিতে। তাঁরই ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনায় সাক্ষাৎকার নিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন আফ্রো-এশীয় সংহতি সংঘের এক রিসেপশানে। উপলক্ষ্যটা কী তা বুঝতে পারলাম না তবে ভারি সুন্দর পরিবেশ! পাহাড়ের ওপর এক রেস্তোরঁয় এই অনুষ্ঠান। লেবানীজ কম্যুনিস্ট পার্টি-প্রধানের সঙ্গে সামান্য আলাপ হলো। তবে খুব জমল সোসালিস্ট পার্টির দুজন সংসদ-সদস্যের সঙ্গে আলোচনায়। কামাল জুমলাত ও তাঁর সহকর্মীর সঙ্গেও কিছু কথাবার্তা হলো। পরদিন তিনি মুখতারায় আমাদের *রঁদেভু* (এপয়ন্টমেন্ট) দিলেন।

৩১.০৭.৭১ শনিবার

সকালবেলা কোন কাজ ছিল না। দারের অফিসে গেলাম। সেখান থেকে রেস্তোরঁ মারুশে। সুন্দর পরিবেশ। সস্তায় ভালো খাবার। সস্তা মানে দেশে প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরঁর দাম।

দুপুরে তিনটের দিকে গাড়ি এসে আমাদের মুখতারার দিকে নিয়ে চলল। সমাজবাদী প্রগতিশীল নেতা কামাল জুমলাতের বাড়ি। শুধু বাড়ি না, একাধারে দুর্গ এবং প্রাসাদ। দেড় ঘন্টার পথশ্রান্তি মুহূর্তে উবে গেল। আতিথেয়তার ত্রুটি নেই। কামাল বে কে প্রায় অসুস্থ মনে হয়। আসলে নাকি লাজুক এবং চালাক। সহজে কিছু আদায় করা সম্ভব নয়। কামাল বে ইংরেজি বোঝেন এবং বলতেও পারেন। তবে ফরাশিই পছন্দ করেন। বাংলাদেশের স্বীকৃতি, শেখ মুজিবের মুক্তি, তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের পাঠানো, কিছু বাঙালি ছাত্র-কর্মকর্তার রাজনৈতিক আশ্রয়– ইত্যাকার বিষয়ে তাঁর অভিমত ও সাহায্য প্রার্থনা– আমাদের এই একান্ত সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু।

কামাল বে শুরু করলেন পুরনো কাসুন্দি : নাসের নেই, আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চলছে অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাকার কারণ দেখিয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতার মধ্যে আত্মলীন হতে চাইলেন তিনি। আমরাও নাছোড়বান্দা। একজনের পর আরেকজন, একটার পর আরেকটা, অথবা একটাই নতুনভাবে উপস্থাপন করি। রাষ্ট্রদূত দার শরণার্থীদের জন্য এখনো লেবানীজ সরকারী সাহায্য যায়নি- একথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। কামাল বে ৪ ঠা আগস্ট দেশের বাইরে যাচ্ছেন। তাই সোমবার (২.৮.৭১) বিকেলে তাঁর পার্টি অফিসে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন তখন।

আমাদের প্রধান 'হোস্ট' (দার সাহেব) ভারি চমৎকার লোক। সর্ব প্রকার সহায়তা তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি। আরব জগৎ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও পরিচিতি পর্যাপ্ত। যথেষ্ট ব্যক্তিগত প্রভাবও রয়েছে দেশে-বিদেশে। অমায়িক, সরল, প্রতীতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্যে ভদ্রলোক অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে অসূয়ার অতীত। তাঁর জন্যেই প্রধানত আমাদের কাজের অগ্রগতি হচ্ছে একটা দৃঢ় ভিত্তি অবলম্বন করে। আলোচনা আর বিতর্ক করে ভারি আরাম! একেবারে non conformist (নন কনফরমিস্ট) আর এন্টি-এভরিথিং (anti-everything)। নিজের দেশ বা নিজের সম্পর্কে যে সব উক্তি করেন তা লেখা যায় না : ... well, I can say that as nobody can ask my loyalty to my country, আমি মিসেস পন্ডিতের মেয়ে–জামাই' কিংবা "Panditji exploited me by allowing me to merry his niece and I also exploited him by leaving the Army and by becoming an Ambassador..." ইত্যাদি, কথায় কথায় "শালা, বাস্টার্ড, আমি দু'দুবার কোর্ট মার্শাল ভুগেছি" শুনে আমার কাছে তাঁকে মনে হয়েছে সম্পূর্ণ আত্মভোলা, a great soul! মোল্লা জালাল আর আমি হাসবো কি কাঁদবো, কতটুকু সমর্থন করবো, আর কতটুকু প্রতিবাদ করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাঁর কয়েকটি আপ্ত বাক্যের একটি হলো: Consistency in politics is the virtue of an ass!

১.৮.১৯৭১ রোববার

রোববার। ছুটির দিন। কর্তার নির্দেশেই নন্দ এলেন আমাদের নিয়ে বাইরে যেতে। তাঁর সঙ্গে আমরা জুনি নামক চমৎকার এক সমুদ্রসৈকতবর্তী এলাকায় চলে এলাম। বৈরুত থেকে ট্যাক্সিতে প্রায় আধঘন্টার পথ। সেখান থেকে তেলেফেরিক বা তারের গাড়ি ধরে উর্ধগামী হয়ে ১৫/২০ মিনিটে আমরা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলাম। আহা, অপূর্ব! মনে হলো, প্রকৃতি যেন চমৎকার 'মড়ারেটলি এয়ার কন্ডিশন্ড' মেজাজে রয়েছে। এতো আরামের আবহাওয়া আর কোথায় কখনো পেয়েছি বলে মনে হয় না। খুবই সুন্দর এক রেস্তোরঁয় বসে ওপর থেকে (২০০০ ফুট) সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী দৃশ্যাবলী অবলোকন করছিলাম। খাবারও ছিল খুব ভালো। পরে 'ফেনিকুলারে' চড়ে আরো ওপরে উঠলাম। সেখানে রয়েছে ছোটখাট এক কুতুবমিনার। তার ওপর স্থাপিত লেডি অব লেবাননের বিশালকায় মূর্তি। গ্রেসফুল! ভালো লেবানীজ ম্যাডোনার প্রতিচ্ছবি মূর্তিমান। ওখানে দেখি, সদ্য বিবাহপর্ব সমাধা করে আসা এক দম্পতি। সঙ্গে ফূর্তিবাজ দল। চারপাশের সবাইকে দেখা গেল আনন্দ উপভোগে মগ্ন।

২.০৮.৭১ সোমবার

আজ সকালে রাষ্ট্রদূত দারের সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সব কিছু বিবেচনার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর। সেখানেই ডক্টর ওমর আবু রিশের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হলো। আগামীকাল সকালে রদেভুঁ। লেবাননের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটায় জোর দিতে হবে–এ বিষয়ে আমরা তিনজনই একমত।

সন্ধ্যেয় কামাল জুমলাত ও তাঁর দশ সহকর্মীর সঙ্গে বৈঠক হলো। প্রথমে আমি ফরাশিতে এবং মোল্লা জালাল ইংরেজিতে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করলাম। তাঁরা কিছুক্ষণ আরবীতে আলোচনা করলেন। পরে আরো কিছু প্রশ্ন করলে আমরা জবাব দিলাম। আবার আমাদের দাবীগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করলাম। দাবীগুলো হলো :

১. বাংলাদেশের স্বীকৃতি

২. তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

৩. রাজনৈতিক আশ্রয়

৪. প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে তাঁদের বিবৃতি।

আরো কিছুক্ষণ তাঁরা আরবীতে আলোচনা করলেন। তারপর বললেন, কামাল বে দুসপ্তাহ পর মস্কো থেকে ফিরে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তখনই তথ্যকেন্দ্র, রাজনৈতিক আশ্রয় ইত্যাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তথ্যকেন্দ্রের যে কাজ তার বিকল্প ব্যবস্থা তিনি বিদেশ যাবার আগেই করবেন। আগামীকাল তাঁর শহরের বাসস্থানে গেলে লেবানীজ সাম্যবাদী দলের প্রধান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। তাঁদের মতে, কাজে এগিয়ে যাবার নীতি হওয়া উচিত slowly but surely (কথাটা ইংরেজিতেই বললেন)। তবে 'গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন (গত নির্বাচনের ভিত্তিতে), শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে' তাঁরা বিবৃতি দিতে পারেন বলে জানালেন। তাঁর অফিসের একজন এবং শ্রমিক দলের এক নেতা আমাদের সঙ্গে আরো বেশি আরব নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবেন।

হোটেলে ফিরলাম দু'ঘণ্টা পর।

৩.০৮.৭১মঙ্গলবার

ডক্টর ওমর আবু রিশে কবি এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। তাছাড়া একজন সত্যিকার pleasing personality চমৎকার ব্যক্তিত্ব। সকালে এসে পৌঁছুতেই তাঁর অভ্যর্থনার বহর আর আমাদের কাজে অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠা বড় ভালো লাগল। রিশে ৬ তারিখ সন্ধ্যেয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তখন আমাদের কথা তাঁকে বলবেন। দুপুরে একাডেমী অব লেটারস-এর সহযোগীদের কাছেও বলবেন। তাঁদেরকে দিয়ে বিবৃতি দেওয়াবার কথা তুলবেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার, তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক আশ্রয় প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চেষ্টাও তিনি করবেন। তিনি যাচ্ছেন চেকোস্লোভাকিয়ায়। ১২ তারিখ ফিরবেন। ৭ তারিখ ফোন করে আমাদের যেতে হবে তাঁর বাসায়, ফলাফল অবগতির জন্য। মিশরের হাসনায়েন হায়কেলের জন্য একটি পত্র দিলেন। হুমায়ুন কবির ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কিছু আলাপ হলো। কবির তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর ওপর কিছু লেখার ইচ্ছা রয়েছে রিশের। সিরীয় পার্লামেন্ট সদস্য–তাঁর ব্রাদার-ইন-ল, খুব সম্ভবত ভগ্নিপতি-নিজে বিয়ে করেছেন ধনী লেবানীজ মহিলাকে, তাঁর কাছে চিঠি লিখে রেখে যাবেন। যাবার সময় দেবেন।

বিকেল ৫টায় তাঁর আয়োজিত রঁদেভু অনুসারে *আল বেয়রাক*-এর সম্পাদক মি.কারামের সাথে দেখা করতে গেলাম।[১৬] এক ঘণ্টার ওপর ফরাশিতে বোঝালাম। তাঁর বড় ভাই মিলহেম কারাম প্রেস-ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল। সম্পাদক মহোদয় সহায়তার আশ্বাস দিলেন। আমাদের খবরাদি পেলে ছাপাবেন। আমাদের প্রেস-কনফারেন্সে সাহায্য করবেন। কভারেজ দেবেন। তাঁর ব্যক্তিগত পূর্ণ সমর্থন রয়েছে–জানালেন। তবে আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে, যেটা এমনিতেই নড়বড়ে– ভাঙন ধরানোর মতো তাঁরা কিছু করতে পারেন না। তাছাড়া আমাদের cause এর বিষয়টা নাকি খুব ভালো জানা নেই। আরবীতে, ফরাশিতে অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ কিছু 'কিতাব' আমাদের বের করতে হবে। বলা বাহুল্য, যে–অল্পস্বল্প প্রচার পুস্তিকা আমরা বিলি করছি সবতো ইংরেজিতে লেখা।

---

[১৬] এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে। ওরা তো 'বঙ্গবন্ধু' বলতে বা বুঝতে পারতো না। আমরা দু'চারজন সাংবাদিককে তা পরে ব্যাখ্যা করে বলি। কিন্তু তাঁদের অনেকেই বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করতেই 'মুজিব আবদেল রহমান' বলতেন। মোল্লা জালাল আর আমি প্রথম দিকে একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে যেতাম এই নাম– বিকৃতিতে।

৪.০৮.৭১ বুধবার

সন্ধ্যা ৭ টায় কামাল বে'র শহরের বাড়িতে কমুনিষ্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য প্রগতিশীল দল সমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। স্বল্প সময়ের জন্য। কিছু বোঝানোর প্রয়াস–অধিকতর আলোচনার জন্য তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিংবা আমরাও করতে পারি। আমাদের হাতে বর্তমানে মোহাম্মেদ কানবাসি, আরব কালচারেল ক্লাব, আল ওয়াদাফ, কর্ণিশ আল মাজবা (Corniche Al Mazvaa), আবাস্সার খানাফানি প্রমুখের ঠিকানা রয়েছে। দেখা করে, তথ্য দিয়ে এঁদেরকে কাজে লাগাতে হবে। কামাল জুমলাত ১৪ তারিখ ফিরবেন। তখন থেকে কাজ শুরু হবে পূর্ণোদ্যমে। কামাল বে আজ ক'দিন ধরে কাগজে বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছেন। আজকের ফরাশি কাগজের কাটিং রাখতে হবে।

ডা. হিতাফ আবদেল সামাদের সঙ্গে দীর্ঘ ৭ বছর পর দেখা আনন্দের। আমার চাচাতো ভাই ডা. হুমায়ুন আজিজ কোরেশী ১৯৬২-৬৩ সালে WHO বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বৃত্তিধারীরূপে প্যারিসে প্রশিক্ষণরত ছিলেন। তাঁরই সহপাঠিনী ডা. হিতাফ। সরল, হাসি-খুশি মেয়ে। আমরা তাঁকে নিয়ে কখনো একটু রগড় করতাম। তিনি কিছু মনে করতেন না। এক সময়ে হোটেলে টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে তাঁর ঠিকানা বের করলাম। তিনি আমার কফির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনিও একজন দ্রুজ মুসলমান। ফিলিস্তিনি দল এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন বললেন।

মোহাম্মদ আলী হিমাদেকে ফোন করে জানলাম, পিয়ের এদে আজ মাত্র এসে পৌঁছাবেন। আগামীকাল তিনিই আমাদের ফোন করবেন। অতএব, আজ আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই।

৫.৮.৭১ বৃহস্পতিবার

সকাল বেলা হিমাদে ফোন করে জানালেন, পিয়ের এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। তবে ৯ তারিখ সকালে তাঁর কাগজ *লরিঅঁ লজুর*-এর সম্পাদক জঁ শুয়েরির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঠিক করেছেন। পৌনে ১১ টায় তাঁর অফিসে গেলে তিনিই নিয়ে যাবেন। আমি অন্যতম সম্পাদক ও *ল মোঁদ* (প্যারিস)-এর বিশেষ প্রতিনিধি এদুয়ার শাব-এর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা জানালে তিনি বললেন যে, এদুয়ার ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে সেখানে।

বিকেলে ফোন করে আমি মোহাম্মদ আলী হিমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। এক ঘণ্টার ওপর বাংলাদেশ পরিস্থিতি, কূটনীতির বিভিন্ন কলা-কৌশল, পাকিস্তানী দূতাবাস নিয়ে আলোচনা হল। তাঁর মতে, আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ স্থানীয় জনসাধারণের উপযোগী করে, অর্থাৎ কিছু ইসলামী রঙ ছড়িয়ে এখানে প্রচার করা দরকার। তাছাড়া

সব আরব সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পাকিস্তানী দূতাবাস এখানে স্থানীয় এলিতের (Elite) সঙ্গে যোগসূত্রবিহীন, নিজেদের মধ্যে নিজেরা আবদ্ধ। *আল জরিদার* জর্জ স্কাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাটদের (অর্থাৎ বাঙ্গালি) সাম্প্রতিক পক্ষবদল বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিদায় হলাম। ক্রমশ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা আন্তরিক ও দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে।

ফিরেই জালাল ভাইকে নিয়ে ছুটলাম রাষ্টদূত দারের বাসায়। ট্যাক্সি দশ পাউন্ড নিল। মানে পঁচিশ টাকা! আজ নুরুল হকের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ হল।[১৭] আগামীকাল বা পরদিন সকালে জানতে পারব ফলাফল। হক সাহেব কুমিল্লা একাডেমীর প্রশাসনিক কর্মকর্তা। বৈরুতে অবস্থানকারী বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয়।

৬.৮.৭১ শুক্রবার

আজ সারাদিন প্রতীক্ষায় কাটলো। বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। শেষে দার নিজেই এলেন আমাদের হোটেলে। নানা বিষয়ে আলাপ হলো। দারের মতে যেহেতু নিক্সনও রাজনৈতিক কারণে গড়িমসি করছে কিংবা পাকিস্তানকে সমর্থন করছে তাই বাংলাদেশের শত্রুমুক্ত হতেও দেরী লাগবে। পরদিনের কার্যক্রম ঠিক করে ট্যাক্সি চড়ে চলে গেলেন। আসলে ননকমফরমিষ্ট লোকটি, উদার ও মুক্তমনা!

সন্ধায় দু-চার মিনিটের জন্য আমরা হোটেলে ফিরলাম বাইরে নৈশ ভোজন শেষ করবার পর। জালাল ভাই তাঁর রুমে গেলেন। আমি নীচে লবিতে বসে আছি। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে সাক্ষাৎ হলো মারিয়ানের সঙ্গে। গৃহযুদ্ধে আমি নিহত হয়েছি ভেবে সে নাকি অনেক কান্নাকাটি করেছে। পরে জনৈক ফরাশি সাংবাদিকের বেতার ভাষণে (ইউরোপ নং ১ চ্যানেলে) শুনতে পায় যে, এক বাঙালি অধ্যাপকের কাছ থেকে তিনি অনেক তথ্য জানতে পারেন। অধ্যাপক খুব ভালো ফরাশি বলেন। আমার নামটিও উল্লেখ করেন। তখন মারিয়ান শান্ত হয়। পরে রেডিও অফিসে ফোন করে আমার খবর জানবার জন্য সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে–ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইতোমধ্যে জালাল ভাই নেমে এসেছেন। আমাকে একজন বিদেশিনীর সঙ্গে বাক্যরত দেখে অবাক হলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম–আমাদের বন্ধু।

---

[১৭] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আগে লেখা হয়নি। আসলে এটা হলো–আমার মাথায় একটা 'দুর্বুদ্ধি' জেগেছিল যে, আসন্ন ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে বৈরুতের বাঙালিরা একটা প্রধান রাজপথে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী পাসপোর্ট পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবেন। এবং নিজেদের বাংলাদেশী ঘোষণা করবেন। অবশ্য আমরা ইতোমধ্যে তাঁদের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় সংগ্রহ করে রাখব।

সোশাল সাইকোলজির ছাত্রী। বাবা সাইকিয়াট্রির শিক্ষক। মাও সমাজকর্মী। তখন আর বেশি কথা হলো না। সে ব্যস্ত ছিল। দামেশ্‌ক যাচ্ছে। পরে দেখা হতে পারে। ওকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে হবে। ও রয়েছে হোটেল আলেকজান্দ্রাতে। [আমাদের হোটেলের কাফেতে পাঁচ/ছয়জন আরব সঙ্গী নিয়ে সে এসেছিল।

৭.০৮.৭১ শনিবার

আজকের দিনটি একেবারেই ব্যর্থ। ড. রিশে সকাল ৭ টায় নাকি চলে গেছেন। অথচ বলেছিলেন, সন্ধ্যায় যাবেন। এবং সকালে আমাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর গতকালের অভিজ্ঞতা জানাবেন। আশ্চর্য! আর তাঁর ফিরতেও নাকি দেরি হবে। সন্ধ্যাবেলায় নন্দ এলেন। হোটেল পরিবর্তন সম্পর্কেই আলাপ হলো। পুরনো আরবী খবরের কাগজের কভারেজ অনুবাদ-পাঠে সময় কাটলো। সন্ধ্যায় জালাল ভাই আর আমি সমুদ্র তীরে কিছু পায়চারি করলাম।

৮.৮.৭১ রোববার

কাজের মধ্যে হোটেল বদলানোই সার। এখন আমরা হোটেল বিবলোসে। তথাকথিত সুইট। একটু মডার্ন। কিন্তু ছেড়ে-আসা হোটেলের চেয়ে কোন দিক থেকে ভালো মনে হলো না। তবু হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ভাড়াও কিছু কম। আর তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ভালো।

মারুশে মধ্যাহ্নভোজন। লতাপাতা আর অসংখ্য সেডার বৃক্ষরাজি রেস্তোরঁর আভ্যন্তরীণ সজ্জার অঙ্গ- বিশেষ। বিকেলে নিদ্রা। সন্ধ্যায় সিনেমা।

৯.৮.৭১ সোমবার

সকাল বেলা মোহাম্মদ আলী হিমাদের সঙ্গে আলাপ।[১৮] ভদ্রলোক আমার খুব তারিফ করছেন। সন্দেহ হচ্ছে, কোনো উদ্দেশ্য আছে নাকি! একটা দসিয়ে (Dossier) বের করবার কথা বললেন। আপাতত সুফল কিছু না দেখা গেলেও আমাদের 'মিশন' নাকি খুবই ফলপ্রসূ হচ্ছে। জঁ শুয়েরি-র কাছে নিয়ে গেলেন। *লরিঅঁ-লজুর*-এর অন্যতম সম্পাদক। সেখানে মারওয়ান হিমাদেও ছিল। মোহাম্মদ আলীর ছেলে। সম্পাদকীয় বিভাগে রয়েছেন। অনেক আলাপ হলো। 'সিসেশান'

[১৮] সংযোজন : এর আগে কি মোহাম্মদ আলী হিমাদে সম্পর্কে লিখেছিলাম? তাঁর স্মৃতি এখনও মানসপটে অটুট। মাঝবয়েসী, উজ্জ্বল চোখমুখ, পাশ্চাত্যের অধ্যাপকসুলভ চেহারা, *আন্-নাহার* শীর্ষক বিখ্যাত পত্রিকাটির প্রকাশক-পরিচালক। চমৎকার ফরাশি বলেন. যুগোস্লাভিয়ায় লেবাননের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ৭.৭.৭৫]

ইত্যাদি বিষয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। সবাই কিছু লিখবেন এবং খবর প্রকাশে সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সন্ধ্যায় হিমাদের তিন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার কথা। কিন্তু তিনি ফোন করেন নি।* আমি মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে সোয়া ৩ টা অবধি একটি ফরাশি প্রবন্ধ ফেঁদে বসেছিলাম। দেখা যাক কী দাঁড়ায়। মালিশ! মা'লিশ! (Never mind, never mind! ca ne fait rien!)।

১০.৮.৭১ মঙ্গলবার

সকালবেলা থেকে নানাজনকে টেলিফোনে পাবার চেষ্টা করছি। হিমাদেকেও পাওয়া গেল না। তিব্বির সঙ্গে আগামীকাল ১২টায় রঁদেভু ঠিক হল। মারিয়ানের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন। পূর্বাপর সহৃদয়া সে। প্যারিসে গেলে এখন কলকাতায় অবস্থানরত আমার অন্তসত্ত্বা স্ত্রী নাসরীনের দেখা-শোনা, এমনকি ডাক্তার ঠিক করে দেওয়া ও অন্যান্য সমস্ত কিছুর ভার নেবে। বিশেষত ওর মা যখন ফ্রান্সের ফ্যামিলি প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, তখন ওর জন্য নানা ব্যবস্থাপনা তিনি অবশ্যই করবেন।

সন্ধ্যায় প্রফেসর নিকোলাস যিয়াদে এলেন। খুব ভালো লোক। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আব্বুর (সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের) বন্ধু। এতদিন দেখা করিনি বলে অনুযোগ করলেন। কতকগুলো বাস্তবমুখী সুপারিশও দিলেন। আমার নতুন আইডিয়া-জাত 'এরাব ফ্রেণ্ডস ফর বাংলাদেশ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পক্ষে অসুবিধার কথা বললেন। কিন্তু তাঁর মতে, 'আওয়ামী লীগ ইনফরমেশন সেন্টার' হতে বাধা হবে না। আরো নতুন আইডিয়া! *ডেইলি স্টারের* সম্পাদক তাঁর বন্ধু। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বিষুদবার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বললেন।

১১.০৮.৭১ বুধবার

সকাল বেলা নন্দ দার সাহেবকে নিয়ে এলেন। সবাই চললাম তিব্বির অফিসে। *আল্ ইয়োম*। আগেই বলেছি তিনি নাসেরপন্থী, গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। তাঁর কাগজের একজন স্টাফ রিপোর্টারকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ আলোচনা করে সমস্যার পরিধি বুঝে নিয়ে বলল, আজকেই সে একটা প্রবন্ধ লিখবে। ওখানে আমাদের পূর্ব পরিচিত একটা ছেলে ছিল। সে বলল, এটা ওর চাচার অফিস।

বিকেলে কাব্বানি এসে আমাদের আরব-কালচারেল ক্লাবে নিয়ে গেল। দশ-বারোজন শ্রোতা। তবে উৎসাহী। দুজন সাংবাদিক এলো দুজন ফটোগ্রাফার নিয়ে। ফটো তুলতে আমরা মানা করলাম। পরিচয়জ্ঞাপনেও অসুবিধা আছে জানালাম। শুধু আমাদের Cause টা ওদের জানাতে এবং ব্যাখ্যা করতে চাই। ওরা বুঝল, মনে

হল। জালাল ভাই বক্তৃতা করলেন। দীর্ঘ। প্রতি বাক্য অনুবাদ করার ফলে দীর্ঘতর হলো। পরে আমি ব্যাখ্যা ও প্রশ্নের জবাব দিলাম। শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই সাম্যবাদী। অনেকটা যেন এপলজেটিক্যালি বলল, আমি কিন্তু সাম্যবাদী। আর বেশির ভাগ চীনের ওপর বেজার। আমাদের ব্যাপারে এবং সুদানে চীনের ভূমিকা অনেকের না-পছন্দ।

সন্ধ্যায় *আন্-নাহারের* সাংবাদিক খাইরুল্লাহ খাইরুল্লাহর সঙ্গে দেখা। পানাহারে শামিল হল সে। বললে, আমাদের আলোচনা সে লিখে দিয়ে এসেছে। আগামীকাল বেরুবে। তার মতে, *আন্-নাহারই* লেবাননে একমাত্র পত্রিকা।

১২.৮.৭১ বৃহস্পতিবার

সকালে প্রফেসর যিয়াদের অফিসে গেলাম। বিরাট লাইব্রেরী! দুজন অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজনকে বাংলাদেশ সম্পকে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়ে এবং তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে, স্বপক্ষে এনেছি বলে ধরে নিতে পারি। ওঁদের সঙ্গে পরে দেখা করতে হবে। (আব্বুর আরেক বন্ধু) প্রফেসর জোরায়েকের সঙ্গে দেখা হলো না।

পরে রু কান্তারি (ভারতীয় দূতাবাস) গেলাম। ডক্টর আমিন হাফিজের সঙ্গে রঁদেভু কাল ভোর সকালে। দুপুরে দামেশ্ক রওনা দিতে হবে।

রাত্তিরে একটা 'মেমোরেণ্ডাম' লিখলাম। ডক্টর হাফিজকে দেব। গতকাল থেকে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন শুরু হয়েছে। খোঁজ খবর পাচ্ছি না। নানা দুশ্চিন্তা।

১৩.৮.৭১ শুক্রবার

খুব সকালে উঠে তৈরি হয়ে রইলাম। নন্দর সঙ্গে চললাম ডক্টর আমিন হাফিজের বাসায়। শহর থেকে একটু দূরে– পাহাড়ি এলাকায় সুন্দর বাড়ি। ড. হাফিজ প্রাক্তন অধ্যাপক (অর্থনীতি), প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমানে বিরোধীদলের প্রভাবশালী সদস্য, ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর কাছে অনেক প্রত্যাশা। কিন্তু জানা গেল, শেষোক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তাঁর পক্ষে (প্রস্তাবিত) বাংলাদেশের আরব বন্ধু সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া, তিনি এ ধরনের কোন সংস্থার সঙ্গে জড়িতও নন। তবে তিনি তাঁর পপুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (২৮ জন সদস্য) এবং ফরেন রিলেশন্স কমিটির (১৫) সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করবেন। শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে পররাষ্ট্র মন্ত্রী কী করলেন তা জানতে চেয়ে বিবৃতি দাবী করবেন। নিজেরাও বিবৃতি দেবেন। (একটা ফলপ্রসু সকাল কাটলো বলা যেতে পারে।)

সিরিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের মিশন
দামেশ্ক্-পর্ব

১৩.৮.৭১ শুক্রবার

দুপুর ২.৩০ আড়াইটেয় রওনা হলাম সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্ক্ (দামাস্কাস)-এর পথে। যে সব পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে গাড়ি চলছিল তা প্রায় পাকিস্তানের সোয়াত এলাকার মতো। তবে এয়ার কন্ডিশনের চাইতে আরামদায়ক মনোরম শীতল আবহাওয়া। সন্ধ্যার আগে দামেশ্ক্ শহরের কাত্তান হোটেলে এসে পৌঁছলাম। (ভারতীয় দূতাবাসের এটাচি ভরদ্বাজ অপেক্ষা করছিলেন)।

বৈরুত থেকে ভাড়া গাড়িতে নন্দর সঙ্গে আমরা দুজন আসছিলাম। হাত মুখ ধুয়ে এলে ভরদ্বাজ আমাদের নিয়ে গেলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত গুহের বাসায়।

[গুহ সাহেব কিছুদিন আগেও ঢাকায় কন্সাল-জেনারেল ছিলেন। আরমানীটোলা হাইস্কুলে আমার শ্বশুর সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের সহপাঠী ছিলেন বলে আমাকে জানালেন। সংযোজন ৭.৭.৭৫]

সুন্দর মাছের ঝোল, ডাল-ভাত খেয়ে জালালভাই আর আমি পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। গুহ সাহেবকে পেলাম একজন অমায়িক, শান্ত ও বুদ্ধিমান ভদ্রলোকরূপে। তবে তাঁর ধারণা, এখানে নাকি আশা-ভরশা কম। দেখা যাক!

*[দামেশক আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নগরী নয়। ১৯৬৫ সালে দু মাসের ব্যবধানে ১ রাত ১ দিন করে দু'দুবার প্যারিস থেকে সিরিয়ান-এরাব এয়ারলাইন্সে দেশে ফেরা ও প্যারিসে ফিরে যাবার কারণে]

১৪.৮.৭১ শনিবার

এখানে যোগাযোগের জন্য তিনটি নাম ঠিকানা পেয়েছিলাম :

১. ডক্টর মুস্তাফা আমিন, আফ্রো-এশীয় সলিডারিটি কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল ... অফিস ফোন-১১৯৫৭৫ মারজে- স্কোয়ার, শামির হোটেলের ওপরতলা ...।

২. মি. মুরাদ কুয়াৎলি, অফিস ফোন ১১৮১৫৪ ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিলের কেউকেটা, ফিরদৌস স্ট্রটে কে.এল.এম অফিসের ওপর তলায়।

৩. হায়দার বোজো, অফিস ফোন ১১৯১৮৬ লীগ অব জুরিস্টস-এর ডিরেক্টর।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যোগাযোগ সম্ভব হলো না।

বিকেলে প্যারিসের সহপাঠী বন্ধু মিশেল আরবাশের ভাই বাহিজ আরবাশ এলো। ফাইন আর্টসের পেইন্টিং-এর ছাত্র। দ্বিতীয় বর্ষ। প্রথম বর্ষে প্রথম হয়েছে। তার সঙ্গেও প্যারিসে দেখা হয়েছিল। সে এসে সিরীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে বেশ সুন্দর বলে গেল :

> 'রাজনৈতিক স্বাধীনতার ঘাটতি আছে বলা চলে বৈকি, কিন্তু একটু খাটলেই এখানে সবাই ভালো রকমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। তাছাড়া সিরীয় জনসাধারণ আসলে সব সময় জীবনযাত্রা ছাড়া অন্য কিছুর কথা চিন্তা করে। তাদের একটা অন্য জগৎ–মনোজগৎ রয়েছে। নিশ্চয়ই সমগ্র আরবদের মধ্যে সিরীয়রা যে সবচে' বেশি ইন্টেলেকচুয়াল তাতে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে?'

ডক্টর ওমর আবু রিশের ভগ্নিপতি ডক্টর মাদানী খিয়ামী (রেক্টর অফ দ্যা ফ্যাকালটি অব মেডিসিন) কে ফোনে পাওয়া গেল। পরদিন সকাল দশটায় রঁদেভু। বাহিজের সাথে জায়গাটা দেখে এলাম। পরদিন সকালেই তো আসতে হবে। সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় গুহ সাহেবের বাড়িতে নৈশভোজনে এলাম। মিসেস গুহ খুব খাতির করলেন। আসলে তাঁর বাপের দেশের লোক তো আমরা! কুমিল্লার মেয়ে তিনি। এদিকে জালাল ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ি আবার কুমিল্লা।

১৫.৮.১৯৭১ রোববার

সকালে খিয়ামীর সাথে দেখা করতে এসে জানলাম, আজ থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পদে যোগদান করেছেন। সুতরাং ভারি ভীড়! তবু আমাদের অনেকক্ষণ রাখলেন ঘরে, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। শেষে কয়েকজন অধ্যাপককে বের করে দেয়া হল। আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করলাম। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে বললেন। তাঁরও বক্তব্য- এখানে খুব-একটা কিছু কেউ করতে পারবে না। পরদিন সকালে আসতে বললেন। (ক্লিনিকের নম্বর ১১২০৫৫, বাসার ফোন নম্বর ৩৩৭৯৩২)।

বিকেলে বাহিজকে দিয়ে ফোন করে জানা গেল, মুরাদ কুয়াৎলি আগামী বিষুদবার পর্যন্ত লাতাকিয়া-তে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনে রত থাকবেন। নিজেরা ড. মুস্তফা আমিনের অফিসে ৩/৪ বার গেলাম। ব্যর্থ হয়ে অতঃপর সুক হামিদিয়া, ওমায়য়াদ মসজিদ, রোকেয়ার কবর, সালাদিনের কবর ইত্যাদি পরিদর্শন করলাম।

১৬.৮.৭১ সোমবার

আজ মিশেল আরবাশ, আমার প্যারিসের বন্ধু, বাইর থেকে ফিরে এসেই ফোন করল। দুপুরে আমাদের হোটেলে এলো। ঘণ্টা খানেক ধরে ওকে বোঝালাম। ও বেশ বুঝে নিল। এবং যোগাযোগ করানোর ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কিছু দায়িত্ব নিলো। সন্ধ্যায় ওর অফিসে গিয়ে মেয়ত্র মোরিস সালিবা, অধুনা আন্ডার-গ্রাউন্ড কম্যুনিষ্ট পার্টির খুবই প্রভাবশালী নেতা (এখন একজন এম.পি/দেপুতে)-র সঙ্গে আলাপ হলো। সংক্ষেপে আমাদের মিশন সম্পর্কে বললাম। তিনি আমাদের ডক্টর মুস্তফা আমীনের কাছে নিয়ে গেলেন। ডক্টর আমিন বেঁটেখাটো, (ভিতরে ভিতরে শয়তান লোক: মনে হলো)। প্রথমেই কথা উঠল দামেস্কে গত আফ্রো-এশীয় সম্মেলন প্রসঙ্গে। আমি বললাম, 'শুনেছি, আমাদের একজন প্রতিনিধি লন্ডন থেকে এসেছিল, তাঁর সঙ্গে কি আপনার আলাপ হয়েছে?'

তাঁর জবাব: 'কতলোক এসবে আসে, সবাইকে মনে রাখা তো সম্ভব নয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানীদের চাইতে তোমাদের ব্যাপারে ভারতীয়দের খুব সোচ্চার দেখা গেল।'

আমি বললাম: 'পাকিস্তান থেকে যারা এসেছে, তারা তো সরকারী প্রতিনিধি। আমাদের কোনো প্রতিনিধি তো কনফারেন্সে নিমন্ত্রণ পায়নি।'

তখন তিনি একটু রেগে মেগে বললেন: 'মাই ফ্রেন্ড (মনামি)! এটা একটি প্রিপ্রেটরি সম্মেলন, কনফারেন্স ছিল না।' সম্মেলনের এবং সিরীয়দের পক্ষে সাফাই গাইলেন।

তখন আমি বললাম : 'আমি তো আপনাদের দোষ দিচ্ছি না, শুধু আমাদের কথাটা শোনানোর অবকাশ হয়নি, সুযোগ ঘটেনি, একথাটাই বলছি এবং ভারতীয়রাও তাই বলেছেন। কেননা আজকে আমাদের সমস্যার সমস্ত বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে। সমস্ত বিশ্ববিবেক ঘুমিয়ে আছে।'

আস্তে আস্তে তিনি ঠাণ্ডা হলেন। এবং নিজেই প্রস্তাব করলেন, আফ্রো-এশীয় সংহতি সমিতির প্রেসিডেন্ট মসিয় বেজবুজের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করবেন। এছাড়া মসিয় সালিবার সূত্রে বার এসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট ল বাতোনীয়ে রিয়াদ আবেদ (Le Batonier Riad Abed)-এর সঙ্গে যেন দেখা করি। এটি বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়ে বিবৃতির জন্য প্রয়োজন।

১৭.৮.১৯৭১ মঙ্গলবার

সালিবা সেটি আজ সন্ধ্যায় ঠিক করে রেখেছেন। সন্ধ্যায় আমরা মিশেলের সঙ্গে ল বাতোনিয়ে-র অফিসে এলাম। খুবই চমৎকার অফিস। তবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। চারজনের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হল। সালিবার কাছ থেকে আবেদ নাকি কিছু শুনেছেন।

এখন আমাদের কাছ থেকে আরো বেশি কিছু শুনতে চান। তার জন্য বিষুদবার বেলা ১টায় দিনক্ষণ ধার্য করলেন। এক্ষুণি তাঁকে ইন্দোনেশীয় জাতীয় দিবসের পার্টিতে যেতে হবে। মা'লিশ! (অর্থাৎ– ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক!)

অগত্যা সময় কাটানোর জন্য একটি সিনেমা হলে ঢুকে পড়লাম, না খেয়ে! হাউসফুল। ভারতীয় ছবি *আরাধনা*, খুবই সাফল্য অর্জন করেছে এখানে। থার্ড ক্লাসের হার বক্সের চাইতে বেশি। খুব ভালো কিছু না। 'মেলো'!

১৮.৮.৭১ বুধবার

মিশেল ফোন করে জজকোর্টে আসতে বলল। সেটিকে আরবীতে বলে–'কাসা আল আদ্‌ল।' সেখানে সাল্ দাভোকায় (sale d'Avocats) গিয়ে আবদেল সালাম হিদার এবং মিশেল দাহবারের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা হলো। হিদারের অনেক প্রশ্নের জবাব দিলাম। হিদার প্রাক্তন জাস্টিস মিনিস্টার এবং ডেপুটি (এম. পি., গোঁড়া মুসলমান। কিন্তু আমাদের ব্যাপারে পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে)। মিশেল দাহবারেরও। তিনি ইংরেজি বলতে পারেন। এই সুযোগে জালাল ভাই (মোল্লা) বললেন : 'আইনজীবীদের সামনে কিছু বলার সুযোগ পেলে ভালো হয়। বিশেষ করে আমি নিজেই তো পেশায় আইনজীবী।' কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়। সরকারের অনুমতি লাগবে। সে অনুমতি না পাওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে। পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করাও অর্থহীন। এখানে চলছে একনায়কত্ব বা গোষ্ঠীতন্ত্র এবং চলছে ত্রাসের রাজত্ব। কেউ স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না।

এখন সালিবা, বেজবুজ আর মিশরীয় যোগাযোগের ওপর নির্ভর করতে হবে।

সন্ধ্যায় গুহ সাহেবের সঙ্গে ঘণ্টা খানেক আলাপ, চা-পান। আলোচনায় জানা গেল, এখানে পাক সরকারের স্পাই রয়েছে এক গ্যাংগ। সব সময় আমাদের যেন কেউ অনুসরণ করছে, মনে হলো।

১৯.৮.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

মিশেল আমাদের ল বাতোনিয়ে-র কাছে নিয়ে যাবে। সাড়ে বারোটায় কোর্টে গিয়ে হাজির হলাম। ওর এক বন্ধু এডভোকেটের সঙ্গে আলাপ হলো বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। ল বাতোনিয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তিনি আমার দেয়া *ট্রুথ এ্যাবাউট বাংলাদেশ* নেড়ে-চেড়ে দেখেছেন এবং এত বড় একটা ট্র্যাজেডি হয়ে গেল দেখে খুবই মর্মাহত। আমি সুযোগ পেয়ে এই ট্র্যাজেডির ব্যাপকতা এবং পশ্চাৎভূমি বিশ্লেষণ করে একটা ছোট-খাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। তিনি ফরাশি বোঝেন তবে বলতে পারেন না ভালো। তাই আরবিই বলেন। মিশেল ফরাশিতে অনুবাদ করে দেয়। আমি আবার ইংরেজি-বাংলায় জালাল ভাইকে বলি। কথা

প্রসঙ্গে ল বাতোনিয়ে জানালেন যে, শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। এবং তাঁর পক্ষে যা সম্ভব তা তিনি করবেন। ইতিমধ্যে চার-পাঁচজন লোক এসে গেলেন, একজন হলেন বৈরুতের নাজাত পার্টির (মুসলিম লীগ?) আদনান হাকিম। আমি আরো কিছু বললাম। তিনি জানতে চাইলেন, আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছি কেন? এবং আমরা স্বাধীনতা পেলে ভারত ও চীন এই 'দুই জায়েন্টের' মাঝখানে টিকে থাকবো কি করে? আমি খুব সাবধানতার সঙ্গে জবাব দিলাম। তিনি বললেন, 'আমরা যেন কিছু মনে না করি। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তাছাড়া কোন দেশের জনগণ যদি তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির সংকল্প হন তাহলে কেউ তাঁদের পিছু হটাতে পারে না।' যাহোক, আপাতত তিনি সিরীয় এডভোকেটদের পক্ষ থেকে একটা চিঠি পাক সরকারের উদ্দেশ্যে লিখে তাদের রাষ্ট্রদূতকে দেবেন। সেখানে তিনি নির্যাতিত শরণার্থীদের সমস্যার কথা উল্লেখ করবেন এবং শেখ মুজিবের বিচার সামরিক আদালতে না করার জন্য বলবেন। আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে সেই চিঠির একটি কপি আমরা নিয়ে যেতে পারি। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বললাম : 'সিরিয়ার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক আরো গভীরতর হোক, এই কামনা করি।'

ল বাতোনিয়ে খুবই আবেগের সঙ্গে এই মন্তব্য গ্রহণ করলেন এবং আমার থিসিসের একটি কপি পেতে বেশ আগ্রহ দেখালেন। আজকে আমাদের প্রথম বড় ধরনের সাফল্য লাভ হলো। মিশেলকে অনেক ধন্যবাদ। সালিবাকেও। মিশেলের মতে, আমরা সত্যিই সাফল্য অর্জন করেছি।

২০.৮.৭১ শুক্রবার

সন্ধ্যায় ড. আমিনকে ফোন করলাম। বেজবুজ ফিরেছেন, তবে লিবীয় এবং মিশরীয় প্রেসিডেন্টদ্বয় এখানে আসার জন্য শনিবার অবধি তিনি খুবই ব্যস্ত। রোববার সন্ধ্যায় তাঁকে ফোন করবো।

কুয়াৎলি আর বোজো এখনও ফেরেননি।

কাল আমরা সিরিয়ার তুর্কী সীমান্তবর্তী দ্বিতীয় বড় শহর আলেপ্‌পো যাব। (ঢাকায় সাবেক ফরাশি কনসাল জেনারেল) সেকুতোভিচে-র সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে (নিজের পরিচয় গোপন করে চট্টগ্রামে ফ্রান্সের অনারারি কনসাল রসুল নিজামের কাজিন পরিচয় দিয়ে ইংরেজিতে)। পরদিন আমার আলেপ্‌পো আগমনের খবর দিলাম। তিনি লাঞ্চের দাওয়াত করলেন। কিন্তু পৌছুতে পারবতো ঠিক সময়ে?

দামেশ্‌ক নতুন রূপ নিয়েছে সন্ধ্যায়। প্রেসিডেন্টদের নিয়ে একটা বিশাল গাড়ি বহর রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম।

আলেপ্পো পর্ব

২১.৮.১৯৭১ শনিবার

সকাল বেলা উঠে, নাশতা খেয়ে না-খেয়ে গাড়ি চেপে বসলাম। আলেপ্পোর পথে। ট্যাক্সি মার্সিডিজ। সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজন আরব মহিলা। পেছনে একজন আরব পুরুষ ও আমরা দু'জন। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে ঘণ্টাখানেক পিছিয়ে পড়লাম। পথে সিরীয় গ্রাম ও শহর। শস্য ক্ষেত্রের শোভা নয়নাভিরাম না হলেও উল্লেখযোগ্য। রাস্তার দু'পাশে যথেষ্ট উর্বরভূমি। হোম্‌স, হামাস, রাস্তান প্রভৃতি শহর বেশ সুন্দর। মধ্যাহ্নভোজনের জন্য রাস্তানের পর একটি মালটিপারপাস হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যাম-এর পাশে চমৎকার এক রেস্তোরাঁয় বসলাম। গাড়িতে ভালোই কাটলো। সহযাত্রীরা বেশ আমুদে ও সহৃদয়।

ব্যারন হোটেলে উঠে স্নান সেরে সেকুতোভিচ সাহেবকে ফোন করলাম।[১৯] আমি ফোন ধরা থাকতেই তাঁর গাড়ি এসে পৌছল। মাঝখানে তিনি বলছিলেন : 'দেখি, কাউকে পাই কিনা পাঠাবার জন্যে'–আর এদিকে লাইন অফ হয়ে গেছে। যাক, আমাকে দেখে যেমন বিস্মিত হলেন, তেমন খুশিও। অনেক আলাপ হলো। লোক যেমন ভালো, তেমনি বাংলাদেশের প্রতি বেশ মমতাও রয়েছে তাঁর। তাই বুদ্ধি বিবেচনা সত্ত্বেও খোলাখুলিভাবে সমস্ত কথা বললেন। কোথায় কিভাবে এগোতে হবে তাও জানালেন। আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আলেপ্পো এসেছি জেনে যেমন অভিভূত হলেন, তেমনি আমি যে বিশেষ সাহায্য চাই অর্থাৎ তাঁর দেশের পূর্ণ সক্রিয় সহানুভূতি ও সমর্থন চাই সে ব্যাপারে কতটুকু, কী করতে পারবেন, তা ভেবে একটু কুণ্ঠিতবোধ করলেন।

---

[১৯] [লুই সেকুতোভিচ তখন আলেপ্পো-তে ফ্রেঞ্চ কন্সাল জেনারেল। এর আগে তিনি ঢাকায় একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে আগষ্ট মাসে আমি যখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। গভীর আগ্রহে তিনি আমাকে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইলেন এবং চট্টগ্রামে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ চালু করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগালেন। ১৯৬৯-'৭০ এ আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ছিল তাঁর আন্তরিক সমর্থন। প্রবীণ জননেতা মাওলানা ভাসানী ও নবীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।] [আলেপ্পো ও পরে বৈরুতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি একাধিকবার তাঁদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।]

মনে পড়ে ১৯৭০ সালে চট্টগ্রামে ফ্রান্সের অনারারি কন্সাল নিয়োগের ব্যাপারে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি তাঁকে সম্ভাব্য কয়েক জনের নাম দিই। তাঁদের মধ্যে একজন–আমার কাজিন সারওয়ার জাহান ডলির স্বামী রসুল নিজাম।

রসুল চট্টগ্রামের প্রখ্যাত সমাজসেবী, সাবেক মেয়র ও.আর নিজামের বড় ছেলে। রোটারি ক্লাব, চট্টগ্রাম ক্লাবের প্রেসিডেন্ট–একজন উদীয়মান, অত্যন্ত ডাইনামিক এবং আধুনিক তরুণ যুবক, যার জুড়ি তখনকার বাংলাদেশে খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। ভালো বাড়ি আছে, পার্টি দেবার ইচ্ছা এবং সংগতিও রয়েছে...ইত্যাকার কারণে মনোনীত হয়েছিলেন, আমার আত্মীয় বলে নয়।

সেকুতোভিচ-এর স্ত্রী একজন চীনা মহিলা এবং ১৯৬৮–র আগে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন বলে জেনেছি।

দামেশ্‌ক্ থেকে নিরাপত্তার কারণে আত্মপরিচয় গোপন রেখে ইংরেজিতে ফোনালাপ করে আমি তাঁর সঙ্গে আলেপ্পোর রঁদেভু ঠিক করি। ইতিপূর্বে অবশ্য জালাল ভাই ও গুহ সাহেবকে এই ভ্রমণের ব্যাপারে রাজি করাতে সমর্থ হই]

২২.৮.৭১ রবিবার

গতকাল লাঞ্চ করতে না পেরে আমরা ডিনার খেয়ে এসেছিলাম। আজ নিমন্ত্রিত ডিনারে আসতেই তিনি বললেন, 'আপনি যা বলেছিলেন তাই ঠিক। একবার দেখা হবার পর দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বারে বোঝাপরাটা আরো ভালো হয়। আমি আমার সরকারকে জানাবো। তাছাড়া বৈরুতে আসব ২৭ তারিখ। আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন। আরও আলাপ হবে। আর হ্যাঁ, আপনার উচিত যত শীঘ্র সম্ভব প্যারিসে যাওয়া। প্রফেসর রুহুলমানের মাধ্যমে মোরো[২০]-র সঙ্গে একটা তৃতীয় পক্ষীয় স্থানে দেখা করা। তাছাড়া নানাভাবে বাংলাদেশ সমস্যাটা ফ্লাশ করা। এতে প্রচণ্ড কাজ দেবে।'

আরো অনেক কথা। রসুলরা যেন আবার আসে, আমি যেন আমার 'চারমিঙ ওয়াইফ'কে নিয়ে একবার আসি। আসবার সময় বারবার করমর্দন ছাড়াও বললেন, আমার দেশের জন্যে আমি যে কাজে নেমেছি তাতে দেশের এবং আমার খুবই উপকার হবে। আমি যে সাফল্যমণ্ডিত হবো এতে তাঁর সন্দেহ নেই কোনো। এবং

---

[২০] লইক মোরো ফরাশি বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। বাংলাদেশের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ও অঁদ্রে মালরোর ভক্ত। বাংলাদেশে তিনি ফ্রান্সের তৃতীয় রাষ্ট্রদূত। আমাকে নাইট উপাধি প্রদান ও পদক পরিয়ে দেবার জন্য তিনি স্বয়ং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। সুদীর্ঘ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমার সম্বর্ধনা গ্রন্থেও লিখেছিলেন।

তার জন্য তাঁর অন্তরের সমস্ত শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি একান্ত আত্মীয়ের মত আলিঙ্গন করলেন। এই বিদায় মুহূর্তে তাঁর চোখের কোণ যেন অশ্রুসজল দেখলাম। আমার এবং আমার দেশের এত বড় একজন হিতৈষী বন্ধুকে ছেড়ে আসতে গিয়ে 'ধন্যবাদ, অরভোয়ার' ছাড়া আর মুখ দিয়ে কথা সরল না। একটি চরম মানবিক উপলব্ধির মুহূর্ত এল জীবনে। ওঁকে ঢাকায় বিদায় দিতে গিয়ে যেমন, এবারও এ ঘটনা বিস্মৃতি এড়িয়ে মনের কোণে জমা থাকবে।

তার আগে সকালে আমরা ন্যাশনাল মিউজিয়াম পরিদর্শন করলাম। খ্রিস্টপূর্ব হিত্তিত এবং অন্যান্য সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো উল্লেখযোগ্য। ক্যানিফর্ম এবং হিরোগ্লিফিক্সেরও ভালো সংগ্রহ রয়েছে। তাছাড়া মৃৎশিল্প এবং অলংকার ইত্যাদির যেখানে আংশিক উদ্ধারকার্য সম্পন্ন সেগুলো টান্সপারেন্ট প্লাস্টিকসের স্ট্যান্ডে রিকনস্ট্রিটিউটেড ফর্মে রাখার পদ্ধতিটি লক্ষণীয়। এরকম আর কোথায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এটি হয়তো আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। তবে আমার অনুমোদন রইল। যদিও শিল্প-বিশেষজ্ঞরা এটিকে 'ছেলেমি' ভাবতে পারেন।

বিকেলে বিখ্যাত সিটাডেল বা দুর্গ দেখতে গেলাম। সত্যিই খুবই ইমপ্রেসিভ! আয়তন, উচ্চতা, প্রাচীর, গড় প্রভৃতি নিয়ে এই পাথরের দুর্গের নির্মাণ–সৌকর্য সত্যিই বিস্ময়কর। বন্দীদের আবাস, খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক কোল্ড স্টোরেজ, মসজিদ, হাম্মাম, দরবার গৃহ–সবই উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের মিদি অঞ্চলের দু'একটি, স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে একটি এবং গ্রানাদার 'আল–হামরা'–র সাথে এর তুলনা চলে। খান এল ওয়াজির, খান এল সাবুন প্রভৃতি পুরোনো বাজার ও ব্যবসায়ীদের ডেরা রীতিমত রোমাঞ্চকর। হাম্মাম লাবাবিদিয়ে বাইর থেকে দেখতেও যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করে। এক্রশ মসজিদের সামনে বাগান এবং মাদ্রাসার মতো কিছু সংলগ্ন কামরা এখনো জ্ঞানচর্চার সাক্ষর বহন করে। ওমায়াদ মসজিদ বিরাটত্বে এবং নির্মাণ-কৌশল উল্লেখযোগ্য। সিরীয় জন-সাধারণকে এখানে এবং অন্যত্র একটু মিস্টিক, আত্মমগ্ন ও আত্মলীন মনে হয়। এঁরা যেন অন্য কিছু, অন্য কোথা, অন্য কোন খানের সন্ধানে। এই বোধ উপলব্ধির জন্যও আলেপ (আলেপ্পা) আগমন সার্থক মনে হলো।

দামেশ্‌ক ফেরা

২৩.৮.৭১ সোমবার

সকাল এগারোটায় ট্যাক্সিযোগে দামেশকের পথে রওনা হলাম। রোদের তাপ উপেক্ষা করে এই ৩৫৫ কিলোমিটার পথযাত্রা। সকাল থেকে আমার ঘাড়ে 'ফেয়াঁয়'[২১] ধরেছে। এবার সহযাত্রী একজন সিরীয়, একজন সদ্য লন্ডন-প্রত্যাগত ইরাকী (রসায়ন বিদ্যার শিক্ষক), একজন নিউইয়র্ক-ফেরত ফিলিস্তিনি। শেষোক্ত দু'জন বাংলাদেশ সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। তবে ফিলিস্তিনি যুবক আমাদের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সাহায্য-প্রার্থী মনে করে খুব যেন অনুমোদন করতে পারছে না। আলেপ্পো যাবার পথেও সহযাত্রীদের সঙ্গে এ ধরনের আলাপ হয়েছিল। অবশ্য কেউ কারো ভাষা বুঝি না ব'লে।

তখন ইয়াহিয়া খান = মোশে দায়ান

শেখ মুজিব = নাসের

এই সহজ সমাধানের সূত্র ধরিয়ে দিলে ওরা অনুমোদন করেছিল। যাক, ফিরতি পথে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য একটি এলাকায় গাড়ি থামানো হয়েছিল।

মাত্র ঘণ্টাখানেক পথ চলেছি। আমরা দুজন ক্ষুধার্ত নই। তাই শুধু 'শায়ি'(চা) আর 'মায়ি' (পানি) খেলাম। গ্রামটির নাম Maarat Al-Noaman, বিখ্যাত কবি আবুল আলা আল-মারীর জন্মস্থান। একটা মিউজিয়াম নাকি আছে। মারীর কয়েকটা পোর্ট্রেট দেখেছি দামেশ্‌কের জাতীয় জাদুঘরে। দুর্ভাগ্য, কোনো পিকচার কার্ড পাইনি।

ভরদ্বাজ এসে গুহ সাহেবের বাসায় নিয়ে গেলেন।

[তাঁকে আলেপ্পোর অভিজ্ঞতা আর পরদিন বৈরুত রওনা দেবার বিষয়ে অবহিত করা হলো]।

---

[২১] ওটা চট্টগ্রামী উপভাষার শব্দ, ঘাড়ে ব্যথা। একে ফরাশিতে বলে torticolis।

বৈরুত : দ্বিতীয় পর্ব

২৪.৮.৭১ মঙ্গলবার

সকাল সাড়ে আটটায় আলেপ্পো থেকে সিকুতোভিচ আমাকে ফোন করে বাগদাদের পাকিস্তানী রাষ্টদূতের (বাঙালি) বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানের খবর জানালেন এবং তার সঙ্গে বার বার আবেগের সুরে 'বোঁ ভয়াজ এ আমিতিয়ে' (শুভযাত্রা ও প্রীতি)।

পরে ড. মুস্তফা আমিনের সঙ্গে দেখা করলাম। না, লোকটাকে যত খারাপ মনে করেছিলাম তত না, আসলেই ভয় পেয়ে আছেন। উনি জানালেন যে, উনি কম্যুনিস্ট। বেজবুজের সঙ্গে এখনো আমাদের ব্যাপারে আলাপ করা সম্ভব হয়নি। মিশেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে। ' আবার আসতে পারলে ভাল হয়'।

বৈরুতের পথে রওনা দিলাম। ভরদ্বাজ চললেন সঙ্গে। সফারা! চলো। কোনো বাধা বিপত্তি নেই। আড়াই ঘন্টার মধ্যে দামেশ্‌ক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে এসে হাজির। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ নতুন-পুরাতনের সমাহারে শুষ্ক শহর থেকে ঝকঝকে তকতকে পাশ্চাত্য আদলের এক বিলাস নগরীর জলীয় আবহাওয়ায় আগমন। এসে আজাদ সাহেবকে পাওয়া গেল।[২২] এবার উঠলাম কার্লটন হোটেলে। এখানকার

[২২] [আজাদ সাহেব হলেন সিলেটের জননেতা আবদুস সামাদ আজাদ। তিনি প্রধান মন্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে বুদাপেশত ও মস্কোয় গিয়েছিলেন বিশ্বশান্তি সম্মেলনে। শুনেছি, সেখানে তাঁর ওকালতি খুব সাফল্য অর্জন করে। আমরা যখন বৈরুতে তাঁকে তখন কাবুলে একটি ইসলামিক সম্মেলনে পাঠানো হয়। আরব জগতের খবরাখবর সম্পর্কে রিপোর্ট নেবার জন্য তিনি বৈরুতে আসেন এবং চারদিন আমাদের সঙ্গে কাটান। বাইরের লোক হিসেবে প্রথমে আমাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেন। কিন্তু কাবুল গমনের পূর্বে আমার সম্পর্কে খুব উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসার কথা লিখে জানান তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদকে।

দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর আজাদ সাহেব যোগ দেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যাবিনেটে। কয়েক মাসের ব্যবধানে সেই সময়ে আমি তাঁর অফিসে ও বাস ভবনে দু'বার সাক্ষাৎ করি। অফিসে তিনি আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন এবং লন্ডনগামী আমাদের প্রথম হাই কমিশনার সৈয়দ আব্দুস সুলতানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেটা ছিল আমার সৌজন্য সাক্ষাৎ। দ্বিতীয়বার তাঁর বাসভবনে দেখা করি খবরের

'কমফোর্ট' প্রশংসনীয়। কিন্তু পি. আই.এ-র আনাগোনা বেশি। [অর্থাৎ ওদের এক-একটা ফ্লাইটের পুরো স্টাফ সাধারণত এক রাত একদিন বিশ্রামের জন্য এখানে অবস্থান করে]।

সন্ধ্যায় দারের বাসায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে আলাপ হলো।

২৫.৮.৭১ বুধবার

রু কান্তারীতে [ভারতীয় দূতাবাসে] কিছু আলাপ আলোচনা সেরে মারুশে মাটির নীচে গুহাভ্যন্তরের রেস্তোরঁয় খেয়ে আজাদ সাহেবকে নিয়ে চললাম গ্রত খাইতার দিকে। অপূর্ব নয়নাভিরাম দৃশ্য! সহজে ভোলা যাবে না।

২৬.৮.৭১ বৃহস্পতিবার

আজ সকালে আমাদের এক বৈঠক হলো রু কান্তারীতে [দার, আজাদ, জালাল ও আমি]। কূটনৈতিক পন্থাসমূহ নিয়ে আলোচনা হল। সায়েব সালাম ডায়ালগের প্রস্তাব দিলে কী করি এ নিয়ে আমরা বিব্রত বোধ করছি। সায়েব সালাম সুন্নী মুসলমান এবং প্রধানমন্ত্রী।

হোটেলের কামরায় বসে লেবানীজ পত্রিকার ইংরেজি তর্জমা পড়াই সার হলো। আরব কালচারাল ক্লাবে আমাদের আলোচনা সভার বিবরণ বেরিয়েছে। খায়রুল্লাহ খায়রুল্লাহ কিছু ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে।

এই দিন আজাদ ভাইকে নিয়ে জালাল ভাই এবং নন্দ কোথায় জানি এক্সকারশানে যায়। আমি কাজের জন্য হোটেলে থেকে যাই।

রাত বারোটায় আজাদ সাহেবকে নিয়ে চললাম এয়ারপোর্টে। দেড়টায় ফিরলাম।

শরীর-মন ভালো নাই।[২৩]

কাগজে লেবাননের সাবেক রাষ্ট্রদূতকে (বাঙালি) বিশেষ দূত হিসেবে পাঠানো হচ্ছে দেখে, তার প্রতিবাদ জানাতে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন এই নিয়োগ সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার মতো একজন মফঃস্বল শিক্ষকের তখন আর কিছু করার ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের মিশনের কালে সেই ভদ্রলোককে আমাদের পক্ষে আনার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং আমরা দু'জন বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি]।

[২৩] [তখনও আমরা দেশ থেকে, কোলকাতা ও দিল্লী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কারো চিঠিপত্র পাচ্ছিনা। সংযোজন : ৭.৭.১৯৭৫]

২৭.৮.৭১ শুক্রবার

কাজকর্ম কিছু তেমন হয়নি এ ক'দিন। নতুন করে পুরোনো যোগাযোগগুলোকে কাজে লাগানো হলো না। সন্ধ্যায় ডা. হিতাফ এলো। সে রেড ক্রিসেন্টের কর্তার সঙ্গে আমাদের ব্যাপারে আলাপ করেছে। আগামী সোমবার ফোন করে জানাবে কখন দেখা হতে পারে। উনি এখন বৈরুতে নেই।

হোটেল সেন্ট জর্জে গেলাম সেকুতোভিচের সঙ্গে ডিনার খেতে। [আমরা কেবল ফরাশি ভাষায় কথা বলবো বলে জালাল ভাই এই ডিনারে শরীক হননি। চমৎকার আলাপী ভদ্রলোক। নানা বিষয়ে আলোচনা হলো : ইবনে বতুতা, মাওলানা ভাসানী ও অন্য প্রসঙ্গ। সেকুতোভিচ দু'বার মাওলানার গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিলেন। বাংলাদেশের সমস্যা, বাংলাদেশ-ফ্রান্স সম্পর্ক নিয়ে অল্প বিস্তর আলোচনা হলো। আমাদের অনতিবিলম্বে প্যারিসে যাবার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্যারিসে গিয়ে কী কী করতে হবে তা আগেও বলেছিলেন, আবার বললেন।

২৮.৮.৭১ শনিবার

আজ কাগজপত্র গুছিয়ে বসলাম। সোমবার দিন পার্লামেন্টের কনফারেন্স নিয়ে প্রস্তুতি চলল। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে প্রকাশিত আফজাল ইকবালের চিঠির একটা প্রতিবাদ মুসাবিদা করলাম। আরো কিছু লিখতে হবে আগামীকাল। তিব্বি, হামাদি প্রমুখ কাউকে ফোন করে পাওয়া গেল না।

২৯.৮.৭১ রবিবার

ঘরে বসে পড়াশুনাই হলো শুধু। সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে পায়চারী।

৩০.৮.৭১ সোমবার

বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট দেরি আছে। পার্লামেন্ট ভবনে এসে পৌছুলাম। উদ্দেশ্য : নির্দিষ্ট কক্ষে যাবার আগে ইচ্ছাকৃত ভুলে কিছু পায়চারি করবো। তাতে আমাদের আগমন বেশি লোকের লক্ষ্যগোচর হবে। কিন্তু ওরা প্রবেশ পথে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। পার্লামেন্টের একটা বিশেষ মন্ত্রণা কক্ষে কিংবা ছোট কনফারেন্স রুমে ঢুকবার পথে অনেকেই জিজ্ঞাসুভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল।

[আহ্লান! ওয়া সাহ্লান! আমাদের গায়ে মুজিব কোট এবং বুকে বাংলাদেশের পতাকা (মানচিত্র খচিত) ইন্‌সিগ্‌নিয়া অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে]।

ড. আমিন হাফেজ আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে কমিশনের সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চেয়ারম্যান ড. হাফেজ ছাড়া সাত জন সদস্য উপস্থিত

ছিলেন। ঘন্টা খানেক আলাপ-আলোচনা চলল। সদস্যরা সবাই ঝানু ব্যক্তি। বেশি সংখ্যকই প্রাক্তন মন্ত্রী। ফরাশি ভাষী দু'জন একটু বেশি সহানুভূতিশীল। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রসঙ্গটা তাঁরা পার্লামেন্টে তুলবেন। জাতিসংঘের মাধ্যমে, গণ নির্বাচনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্পর্কেও কেউ মন্তব্য করলেন। ড. হাফেজ প্যারিসে ভারতীয় প্রস্তাব (ইন্টারপার্লামেন্টারি বোর্ডে) সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পার্লামেন্ট থেকে বেরোতেই কয়েকজন আমাদের ফটো তুললেন। এবার আর বাধা দেওয়া সম্ভব হল না। *আল ইয়োমের* সাংবাদিক নাবিল বারাদি সুকৌশলে অন্যান্য সাংবাদিকদের কবল থেকে রক্ষা করে তাঁর অফিসে নিয়ে এল। সমস্ত ডিটেইল জেনে মেমোরেণ্ডাম রেখে আবার ফটো তুলিয়ে বিদায় দিল। ওয়াফিক তিব্বির সঙ্গে দেখা হল। নাবিল কুয়েত এবং দামেশকের দু'টি কাগজের জন্যও প্রবন্ধ লিখবে।

সন্ধ্যায় অনেককে ফোন করে শুধু ডা. হিতাফ এবং ড. জিয়াদেকে পেলাম।

৩১.৮.৭১ মঙ্গলবার

আজ সকালে শ্রী দারের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। গত রাত্রে *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড* সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি দেখালাম। তথ্য কেন্দ্রের বাজেট সম্পর্কে আলোচনা হল। এখনকার কর্মসূচি নির্ধারিত হলো। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেখা-সাক্ষাৎ চালিয়ে যেতে হবে। আরবি মেমোরেন্ডামের কপি করতে দেওয়া হলো।

ডা. হিতাফ-নির্ধারিত রঁদেভুতে গেলাম বিকাল সাড়ে চারটায়। রেড ক্রিসেন্টের নেতা ডা. ফত্‌হি-র সঙ্গে দেখা হবার কথা। তিনি অন্য কাজে চলে যাওয়াতে আমি ওদের কয়েকজনকে বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের এবং বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা জানালাম। কিন্তু সহানুভূতি ছাড়া সাহায্যের ব্যাপারে কোন কথাই তারা বললো না।

অতঃপর *ডেইলি স্টারের* প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলাম। অধ্যাপক জিয়াদের বন্ধু , গত ডিসেম্বর মাসে করাচিতে ছিলেন। কাজের চাপ থাকায় তাঁকে ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা না করে চলে আসতে হয়। তাঁর মতে, আরব পত্রিকায় বাংলাদেশের ব্যাপারে কম বেশি যাই প্রকাশ হোক না কেন, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তেমন কিছু কেউ লিখেনি এবং শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি বললেন, মিশরকে সমস্ত তথ্য জানিয়ে এবং সৌদি আরবকে ইসলামের দোহাই দিয়ে আমাদের সমর্থন করাতে হবে। মিশর তাঁর অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃআরব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায়, সৌদি আরব পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায়

রাখতে চায় বলে আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেনি। আমরা চলে যাবার সময় তিনি আমাদের সম্পর্কে লিখবেন, বললেন।

১.৯.৭১ বুধবার

বিকেলে *আন্-নাহার*-এর প্রধান সম্পাদক লুই আল হজ্জের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। লোক খুব সুবিধার মনে হল না। দুজন তরুণ সাংবাদিকও সেখানে ছিলেন। ফরাশিতে আমাদের দুভার্গ্য ও সংগ্রামের কাহিনী বললাম এবং ওঁদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে চললাম। হজ্জ সাহেবকে আমাদের 'মেমোরেন্ডাম' এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে সাংবাদিক নির্যাতন' সংবাদটা ছাপতে দিলাম। তিনি আগামীকাল বিকেলে ওগুলো পড়বেন এবং কিছু করা যায় কিনা দেখবেন। এক্ষণে আরব ফেডারেশানের প্রশ্নে তিনি খুব ব্যস্ত।

২.৯.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের কাছে লেখা চিঠিখানা চূড়ান্ত টাইপ করতে দিলাম।

ল ফিগারো-র সাংবাদিক পিয়ের বোয়া-র সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাক্ষাৎকার পড়লাম। ইয়াহিয়া একটা পশু। [বঙ্গবন্ধু ও মিসেস গান্ধী সম্বন্ধে ও যা তা বলেছে]। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে দেখা হলে সে নাকি বলবে 'চুপ কর বেটি, আমাকে শান্তিতে থাকতে দে। আমার রিফিউজিদের ফেরৎ পাঠা'। পিয়ের বোয়া ইয়াহিয়াকে চেঙ্গিস খাঁর আসনে বসাতে চান না; সে শুধু সৈনিক, ইয়াহিয়ার উক্তি পাঠকদের বিচার করতে তিনি বলেছেন। কিন্তু বিচারের ক্ষমতা তো পাঠক সমাজ হারিয়ে ফেলেছে। তবে আশা করব, সারা বিশ্বের সুধী সমাজে এ নিয়ে কথা উঠবে।

মধ্যাহ্নভোজনে সঙ্গ দিল খাইরুল্লাহ খাইরুল্লাহ। [জালাল-ভাইয়ের ভাষায়, 'ডবল খায়রুল্লাহ]। *আন্-নাহার* পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক। ও ইতিপূর্বে আরব বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা সভার বিবরণ প্রকাশ করেছিল। নতুন কিছু ম্যাটার চাইল। কিন্তু কী দেব? দেশ থেকে কিছুই আসছে না। বললাম, ইয়াহিয়ার বক্তব্যের প্রতিবাদ ছাপতে পার। কিছু একটা লেখ। এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে হলেও। তাও শেষ অবধি আমাদের পক্ষে আসবে। ও হাসল। বলল, 'দামেশ্‌ক সফর সম্পর্কে লিখব?'– 'না, দামেশকে যেটুকু সাফল্য তা লেখার মতো হয়নি। কেননা ল' বাতোনিয়ে-র বিবৃতি এখনো আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি।'

পার্লামেন্ট ভবনে আমাদের বক্তব্য পেশ করবার ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন কাগজে ছবি ও বিবরণ সমৃদ্ধ ফাইল (কাটিং) তৈরি হয়েছে।

৩.৯.১৯৭১ শুক্রবার

কয়েকদিন ধরে এবং আজ সকালেও শুধু ফোন করে যাচ্ছি। কাউকে ধরতে পারছিনা। বড় বড় নেতা, বুদ্ধিজীবীরা ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত রয়েছেন। শহরের বাড়িতে, কর্মস্থলে, পাহাড়ের বাড়িতে বা অন্যত্র। কখনোবা উল্লিখিত তিন সম্ভাব্য স্থানে ফোন করা হয়েছে। কিন্তু অনির্দিষ্ট অন্যত্রে যোগাযোগ সম্ভব নয়। ভারি পেরেশানের ব্যাপার।

গতকাল খায়রুল্লাহ খায়রুল্লাহ বলছিল, 'এখানে তোমরা কী চাও? টাকা পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র? কিছু পাবা না। কেউ কেউ মুখে সমর্থন জানাবে, কিন্তু কিছু করবে না। সুতরাং এতে কি সময়, পরিশ্রম আর অর্থের অপচয় করছো না?'

কথাটা সত্যি ভেবে দেখবার মতো। আমি অবশ্য জবাব দিলাম– 'ফরাশি গভর্নর মরক্কোর প্রাসাদে যাবার সময় বলছিলেন, রাস্তায় বড্ড গরম। বৃক্ষ রোপণ করা দরকার।' সঙ্গী অফিসার বলল, 'হুজুর, সেই বৃক্ষের ছায়া আসতে পঞ্চাশটি বছর লাগবে।' ফরাশি মিলিটারি গভর্নর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সেজন্যই কালবিলম্ব না করে কাজ শুরু করা দরকার।' সাম্প্রতিক গোয়েন্দাবৃত্তির ওপর (এসপিউনাজ) কোন সরকারি ডকুমেন্টে (ব্রিটিশ) এই 'এনেকডটটি' ভূমিকা স্বরূপ দিয়েই শুরু করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের সেরকম দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। তাই আজ শ্রীদার বলছিলেন, 'এখানে, অর্থাৎ আরব জগতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মতামত হয়তো 'হস্টাইল', নয়তো 'নিগেটিভলি নিউট্র্যাল'। সবাইকে 'নিউট্রালাইজ' করবার প্রয়াসই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। মোটামুটিভাবে 'নিউট্রাল' হলেও সেটাই হবে আমাদের বড় সাফল্য।'

৪.৯.১৯৭১ শনিবার

ভারি মজার ব্যাপার ঘটলো দুপুরে রেস্তোরঁয় খেতে এসে। এসেছিলাম রাফিক মারুশ রেস্তোরঁয়। আগে কয়েকবার এসেছি। সুন্দর পরিবেশ, সস্তায় ভালো খাবার। একটি বাচ্চা ছেলে [বারো-চৌদ্দ বছর বয়স, সুট-টাই পরা] তার সপ্রতিভ মুরুব্বীচালে হাঁটা, বলা আর পরিবেশনের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে হঠাৎ এসে বললে,'পরশু কাগজে আমি তোমাদের দুজনের ছবি দেখেছি।'

–সত্যি? অসম্ভব!

–না, আমি দেখেছি। কাগজখানা, *আন্-নাহার*, আমি রেখে দিয়েছি। তোমরা আবার এলে চেহারা মিলিয়ে নেব বলে। এখন আমি নিশ্চিত যে, সে তোমাদের ছবি। তোমরা কোন একটা দলের লোক, তাই না?

কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেও আমরা অনেকক্ষণ অস্বীকার করে গেলাম এবং তাকে ভুলোবার জন্য অন্য কথাবার্তা পাড়লাম। সে সেকেন্ডারি ফোর্থ ক্লাসে পড়ে। এটা তার গ্রীষ্মকালীন চাকুরি। পরে তাকে আল ইয়োমের ছবি দেখালে সে বললে, 'না, এটি না, অন্যটি–তোমাদেরই। আমি কাল আনবো। তোমরা আসবে তো?'

সন্ধ্যায় নাবিল বারাদি এলো। করিতকর্মা ছেলে, মনে হচ্ছে। কিছুটা ভারত–বিদ্বেষী, সে আমাদের কিছু কাজ করে দিতে চায়। *আল–ইয়োমের* সংবাদ–নিবন্ধ ওরই। কাজের লোক। তবে একটু অতিরিক্ত চালু। আর আধুনিক চরিত্রের তথা একটু 'লুজ মরাল'–এর। সোজা বললো, 'উপহার, উপঢৌকন, পয়সাকড়ি কিছু ঢালতে হবে। তার উপর বিশেষ 'এপ্রোচ' দিতে হবে। আল ফাতাহ–ও তাই করে। পাকিস্তানীরা জানে না। তাই পত্রিকার উপর তাদের বিশেষ হোল্ড নেই। আমি তোমাদের জন্য সব করে দিতে পারি। অর্থাৎ তোমাদেরও আমার ও অন্যান্যদের জন্য কিছু করতে হবে।'

আমার শরীরটা হঠাৎ ভীষণভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। আমি শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। জালাল ভাই ওর সঙ্গে বেরোলেন।

৫.৯.১৯৭১ রোববার

রাত্রে খবর শুনেছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া মার্চের 'রাষ্ট্রবিরোধী' কাজের সঙ্গে জড়িত সবাইকে 'এ্যামনেস্টি' দিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই এক নতুন ভাঁওতাবাজি।

কাগজে প্যারিসে ইন্টার–পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের ৫৯তম কনফারেন্সের বিবরণ পড়লাম। প্রেসিডেন্ট পোঁপিদু-র বক্তৃতায় সুন্দর কথা আছে। হায় আল্লাহ, শুধু কথাই। কেউ কাজে লাগাতে চায় না। কাউন্সিল মিটিং-এ ভারতীয় স্পীকার দিলন নাকি বাংলাদেশের ওপর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেটি সেখানে পাশ হতে পারেনি বলে তার ওপর বিশেষ ডিবেট হলো না। পরে প্লেনারি সেশনে সেটি দেওয়া হবে।

এটি সত্যিই ভারী ভুল হয়ে গেল। কয়েকজন এম.এন.এ নিয়ে আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের বক্তব্য পেশ করবার এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বেশ কিছু পাবলিসিটি আর সমর্থন পাওয়া যেত। কিন্তু কোন নির্দেশ ব্যতিরেকে কী করে যাই? এদিকে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও লেবানিজ প্রতিনিধিরা শুধু সিরিয়া আর জেরুজালেমের প্রসঙ্গেই কথা বলেছেন। আগামী বছর এর সম্মেলন হবে ২১-২৯ সেপ্টেম্বর (১৯৭২), রোমে।

৬.৯.১৯৭১ সোমবার

আজও অনেককে ফোন করলাম। কাউকেই পেলাম না। শ্রী দার আমাদের চলে যাওয়ার পক্ষপাতী নন। কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বাদ দিলেও, এখানকার আরাম আয়েসপূর্ণ জীবনও আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। প্রধানত যে-কাজের জন্য আমরা এসেছি তার কী করতে পারলাম? জানি, দীর্ঘদিনের পরিণামে এর দাম আছে, কিন্তু এখানে এভাবে কাজ করার মানে খুঁজে পাচ্ছি না। এই তো সেদিন ড. আমিন এবং অন্যান্যরা প্যারিসের বৈঠকে বাংলাদেশ প্রস্তাব সমর্থন করবেন এরকম প্রতিশ্রুতি না হলেও যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন *ল মোঁদ* এ দেখা গেল : ইরান, জর্দান, লেবানন, মরক্কো, নাইজেরিয়া, তিউনিশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি সহ ৭৪ জন প্রতিনিধি আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। এছাড়া রয়েছে ১৯৫ জন যাঁরা ভোটদানে বিরত রয়েছেন। অবশ্য ৪৯৮ জন আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী এবং বিরতি-রা মিলে যেহেতু . . . . . (কিছু লেখা হয়নি, এখন বাক্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়)।

৭.৯.১৯৭১ মঙ্গলবার

সকালবেলা অনেক কাজ হলো। ডক্টর ওমর আবু রিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো অনেকদিন পর। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর আলাপ চেকোস্লোভাকিয়া যাবার আগে, ফলপ্রসূ হয়নি। তবে তিনি হয়তো আবার চেষ্টা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করানোর চেষ্টা করবেন। তাছাড়া সিরিয়ায় আবার একটা-দুটা চিঠি নিয়ে যেতে বললেন। খুব সম্ভবত, ওখানকার ভাইস-প্রেসিডেন্টের কাছেও লিখবেন। পরশু সকালে ফোন করতে বললেন।

বিশ্ব শান্তি সংসদের মারুফ সাদের সঙ্গে আলাপ। দিল্লীর বাংলাদেশ সম্মেলন যাচ্ছেন। আমন্ত্রিত অতিথি। বুদাপেশতের সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়নি বা তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেও তিনি অজ্ঞ। তবে 'বাংলাদেশ' এরকম কিছু কথা যেন তিনি শুনেছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় প্রতিনিধির কাছে। বেশ মোটাসোটা, শক্ত সমর্থ পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোক। ইংরেজি-ফরাশি কোনোটাই ভালো বলতে পারেন না। মি.আহমদ (জালাল ভাই) তাঁকে বোঝালেন। আমাদের তিনি তাঁর 'সাইদা'-র মিউনিসিপাল লাইব্রেরীতে বক্তৃতা ও মধ্যাহ্নভোজনের আমন্ত্রণ জানালেন। ...হোসেইনী ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে আগ্রহ দেখালেন।

কামাল জুমলাতের সঙ্গে ফোনে আলাপ হলো। আজ কাগজে তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের সমর্থনে যে প্রস্তাব পাশের খবর বেরিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ

জানালাম। রোববার মুখতারায় যাবার এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ জানালেন তিনি।

এরপর ইন্ডিয়ান ইনসিউরেন্সের মি. রাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। রাষ্ট্রপতির ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন তিনি। দু-এক দিন অপেক্ষা করতে হবে। সকাল বেলা আব্বুর পরিচিত বিশরা ঘোরায়েব-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সন্ধ্যায় দেখা হলো। তিনি কিছু প্র্যাকটিক্যাল সাজেশান দিলেন। আগামীকাল কায়রো যেতে বললেন। আরব লীগের অধিবেশনের লগ্নে। কিন্তু যাওয়া যাবে না। মুরুব্বীর মানা।

৮.৯.১৯৭১ বুধবার

সকাল বেলা [আসলে সারাদিনই] লেখাপড়ায় কাটলো। লেখার মধ্যে বাংলাদেশ প্রচার কেন্দ্রের জন্য বাজেট চূড়ান্তকরণ করা হলো।

৯.৯.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

সকালে আজগুবি এক ফোন-কল 'হ্যাল্লো', মি. কাদের।[২৪] আমি *আল মোহায়ের* পত্রিকা থেকে বলছি। ভালো।

তোমার কোনো স্টেটমেন্ট দেবার আছে?

না তো।

তুমি কি বাংলাদেশের পক্ষে?

হ্যাঁ।

তুমি একজন ট্রেটর।পাকিস্তানের ট্রেটর।'

আমি ট্রেটর নই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা। শেখ মুজিব পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তোমরা ট্রেটর। শেখ মুজিবও। এদেশ ছেড়ে চলে যাও।

রিসিভার ছেড়ে দিলাম। আশ্চর্য! কে হতে পারে? হয়তো পাকিস্তানী দূতাবাসের প্রেস এটাচী খুরশীদ হবে। সে নাকি ইরাকী আর গুণ্ডা প্রকৃতির লোক।

[২৪] [তখন আমার ছদ্মনাম ছিল মোহাম্মদ শামসুল কাদের। সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে এম.এস.কিউ. দেবার সুবিধার্থে ভেবে চিন্তে দিল্লীতে এই নাম বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। জালাল ভাই ও আলফ্রেড ভাজ (ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা) সানন্দে অনুমোদন করেছিলেন]।

ল ফিগারোর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'গ্রঁ রপোরতাজ' পড়া গেল। পিয়ের বোয়া বেশ biased, অবশ্য factual হবার চেষ্টা করেছেন। গত ৪ তারিখের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় জঁ-পল সার্ত্রের মার্চের ইন্টারভিউ খুবই ইন্টারেসটিং এবং স্টীমুলেটিং। ইন্টেলেকচুয়েলদের রোল দায়িত্ব, ও কর্তব্য সম্পর্কে সত্যিকার পথ নির্দেশ রয়েছে।[২৫]

১০.৯.১৯৭১ শুক্রবার

সকাল এগারোটায় ডক্টর ওমর আবু রিশের সঙ্গে রঁদেভু। তাঁর সেই সুন্দর স্টাডিতে এসে হাজির হলাম যথাসময়। কালো কফি আর শাদা মার্লবরো। অমায়িক, উদার আর অত্যন্ত এরিস্টোক্রেটিক সজ্জন ড. রিশে। লেবাননের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করেছিলেন আগে। সুবিধা হয়নি। আগামী কাল চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেন। সেখানে আবার চেষ্টা চালাবেন। বিখ্যাত এক শিয়া নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। অনেক জায়গায় খোঁজ করেও তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। সিরিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার জন্য তাঁর এক বন্ধুকে পত্র দিলেন। সেটি আমরা নিয়ে যাব। Arab Friends for Bangladesh গঠন সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। বললেন, যদুমধুকে নিয়ে সংগঠন করে লাভ নেই। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু humanitarian দিক নিয়ে কথা বলা যাবে। তাও সুন্নী নেতারা বিরোধিতা করবেন। তাঁর বন্ধু শেখ আব্দুল্লাহ আলায়লীর সঙ্গে আগামীকাল তিনটায় রঁদেভু ঠিক করে দিলেন। তাঁকে সোম-মঙ্গলবার ফোন করতে হবে।

সন্ধ্যায় মার্কিন ছবি *সোলজার ব্লু* দেখলাম। মানুষিক পশুত্ব আর মানবিকতার গভীর দ্বন্দ্বের ছায়াছবি। ১৮৬৪ সালে রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে মার্কিন অভিযানের পাশবিকতা দেখানো হয়েছে।

সন্ধ্যায় বেরুনোর আগে একটা ফোন-কল পেলাম ওয়াহিদ মালিকের কাছ থেকে : আমাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা রয়েছে। হোটেলে বা বাইরে যেতে যেন কোন ভয় না করি।

[২৫] [দুর্ভাগ্য, সার্ত্র আমাদের সমর্থন করেননি। চীনের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ এর অন্যতম কারণ। ১৯৯২ সালে প্যারিসে প্রফেসর লুই দুমোঁ আমাকে বলেছিলেন, বিখ্যাত ফরাশি বুদ্ধিজীবীদের তিনি বহু চেষ্টা করেও বাংলাদেশের পক্ষে বিবৃতি দেওয়াতে পারেননি। অবশেষে তিনি স্বয়ং একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় এই বিষয়ে আমি লিখেছি]।

[কিন্তু] কে এই ওয়াহিদ? আর ব্যবস্থা কতটুকু [কার্যকর]?

১১.৯.১৯৭১ শনিবার

অনেক খোঁজাখুঁজি করে [আল্লামা] শেখ আবদুল্লাহ আলায়লির বাসায় এলাম। [আসবাব পত্র] সবকিছু আধুনিক হলেও শেখ সাহেব ফ্লোরে কুশনে উপবিষ্ট। আল-আজহার থেকে তাঁর এই অভ্যাস। শেখ সমস্ত আরব জগতে নাকি একজন বিরাট স্কলার, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, ফিললজিস্ট ইত্যাদি। এনসাইক্লোপেডিয়ার মতো তাঁর এক সিরিজ বড় বড় বাঁধানো সুদৃশ্য বই দেখেছিলাম ওমর আবু রিশের স্টাডিতে। এখানে এসে জানলাম (আলোচনার শেষে) তিনি কাউন্সিল অব উলেমার সেক্রেটারি-জেনারেল এবং লেবানীজ একাডেমীর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। শুনে এসেছিলাম, তাঁর কিছু বামপন্থী অন্তত সমাজবাদী লিনিং (সম্পৃক্ততা) রয়েছে। কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হল, বেশ গোঁড়া। বোঝা যাচ্ছিল, ভারি তেজী লোক। তাঁর পাণ্ডিত্যময় ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হচ্ছিল যখন শুধুমাত্র আরবীতে কথা বলছিলেন। তাঁর জামাতা লেবানীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক, ডক্টর... (তিনি) ফরাশি ভাষায় অনুবাদ করছিলেন। শেখ বেঁটে খাটো শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যের মাঝারি চেহারার লোক। চোখ দুটো বেশ বড় আর উজ্জ্বল। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে : পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র' সে হিসাবে তার ঐক্যই তিনি কামনা করেন। 'ডিস প্যারিটি [অসাম্য] , অন্যায়-অবিচার যা হয়েছে তা ভুলে গিয়ে মিলে-মিশে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করা দরকার।' আমরা আস্তে আস্তে তূণে বাণ যা ছিল একে একে ছাড়তে লাগলাম–আরবদের ওপর তুর্কি অত্যাচার, আরব ফেডারেশানের উদাহরণও দিলাম। শেষ অবধি বোঝা গেল, তাঁর মনকে একটু নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছি। তিনি বললেন, ব্যক্তিগতভাবে এবং উলেমা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বিবৃতি এবং অন্যভাবে শেখ মুজিবের মুক্তি-দাবী, অন্যায়-অবিচারের অবসান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করবেন। এ ছাড়া তিনি লেবানীজ একাডেমীর মাধ্যমেও সে চেষ্টা করবেন। একাডেমীর প্রেসিডেন্ট জোয়াদ বুলুজকে যোগাযোগ করতে বললেন। বুলুজ এহদেনে থাকেন। এদেশের প্রেসিডেন্টও এখন সেখানে। ১৬ তারিখ একাডেমীর মিটিং রয়েছে। ২৫ তারিখের দিকে ওলেমা কাউন্সিলের মিটিংয়ের ব্যাপারে তাঁকে যোগাযোগ করতে হবে।

১২.৯.১৯৭১ রোববার

সকালে তাকিয়েদ্দীন সোলের সঙ্গে ফোনে আলাপ হলো। সোমবার ফোন করতে হবে। সম্ভব হলে সেদিন দুপুর বারোটায় দেখা করতে হবে। প্রাক্তন মন্ত্রী

সোল দিল্লীর বাংলাদেশ সম্মেলনে আমন্ত্রিত। *পারী মাচে* (বিখ্যাত ফরাশি পত্রিকা) বাংলাদেশের ওপর বিশেষ প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

আজ সকালে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মুখতারায় গেলাম কামাল জুমলাতের দরবারে। অসংখ্য গাড়ি, লোকজন প্রতীক্ষা করছে। সুইস পতাকাধারী সিডি গাড়ি দেখলাম। শুনলাম, রুমানিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কামাল বে আলাপরত। পরে এসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন খুবই আন্তরিকতার সাথে। আমাদের প্রয়াস ফলপ্রসূ মনে হলো। তবে কামাল বে যে গতকাল ফোনে মধ্যাহ্নভোজনের দাওয়াতও দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কিছু না শোনাতে আমরা একটু হতাশ হয়েই চলে এলাম। ক্ষতিপূরণ করলাম ভারতীয় রেস্তোরঁ 'মহারাজা কর্ণারে' ইচ্ছামত খেয়ে।

১৩.৯.১৯৭১ সোমবার

অনেককে ফোন করে ব্যর্থ হলাম। কাউকে ধরা মুশকিল। মহেন্দ্র মশায়ের চেম্বারে [রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে শার্জে দাফের] মাহমুদ তুব্বু-র সঙ্গে আলাপ। খুব লম্বাচওড়া, সদালাপী, একটু বোকা-বোকা লোকটি। ভালো মানুষ। সাম্প্রতিক পীস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একজন মার্কিন, একজন ইতালিয়ান এম.পি-র সঙ্গে বাঙালি শরণার্থীদের জন্য সাহায্য নিয়ে গিয়েছিলেন। উচ্ছ্বসিত মন্তব্য : বাঙালিদের পক্ষে। ভদ্রলোক ত্রিপলির উকিল। বামপন্থী।

১৪.৯.১৯৭১ মঙ্গলবার।

আজ বিকেলে সাংবাদিক নাবিল বারাদিকে নিয়ে সাইদার দিকে চললাম। মারফ সা'দের নিমন্ত্রণ। সাইদা বৈরুত থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে। সাইদা মিউনেসিপালিটির চেয়ারম্যান সা'দ আমাদের তাঁর পাহাড়ের বাড়িতে নিয়ে চললেন। ভেতরে দিকে ঘুরতি পথে আরো ৩৮ কি.মি.যেতে হল। চমৎকার দৃশ্য! পাইন বাগানের মধ্যে মারুফ সা'দের বাড়িটি ভারি সুন্দর। বিশ-পঁচিশ জন লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বসতে বসতে আরো ১০/১৫ জন এলো। সবাই বাংলাদেশ সম্পর্কে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। আমি প্রথম ফরাশিতে সমস্ত ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। পরে জালাল ভাই কিছু বললেন ইংরেজিতে। প্রচুর খাওয়া আর পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সব কিছুর সদ্-ব্যবহার করতে করতে আরো দীর্ঘ অলোচনা হলো। আজকের সন্ধ্যা আমাদের প্রথম সার্থক সন্ধ্যা–সত্যিকার আরবী পরিবেশে সজ্জন বন্ধুদের মধ্যে। এই আরবী আতিথেয়তা মনে রাখবার মতো। ফিরতি পথে নাবিলের সঙ্গে বাংলাদেশ ও লেবানন [দুই দেশের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ] প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করলাম।

[বাংলাদেশের] প্রতিনিধি দুজনের জন্য সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটির কথা আমার এখনও মনে পড়ে– বিশেষ করে মারুফ সা'দের মেয়ে, এক প্রৌঢ় প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের কথা এবং উপস্থিত অনেকের মন্তব্য। ওরা অর্থ বা অন্য ধরনের সাহায্য দিতে প্রস্তুত। উচ্ছ্বাস এবং সাফল্যের আনন্দে সে রাত্রে জালাল ভাই আর আমি তাই প্রবল উল্লসিতবোধ করেছি। ৭.৭.৭৫]

১৫.৯.১৯৭১ বুধবার

মাহমুদ তুব্বুকে অনেক কষ্টে টেলিফোনে পাবার পর ওঁর সঙ্গে দেখা করে ওঁকে নিয়ে কামাল জুমলাতের বাসায় গেলাম। সেখানেও দরবার! যাক, কামাল বে আমাদের তথ্যকেন্দ্রের জন্য তাঁর অফিস ব্যবহার করতে অনুমতি দিলেন। তুব্বু যে প্রেস কনফারেন্স করতে যাচ্ছেন তাতে তিনি থাকতে পারবেন না, তবে তাঁর পার্টি অফিসে তা হতে পারে। আমার অনুরোধ রইলো : তাঁর দলের রবার্ট হান্না দিল্লী সম্মেলন থেকে ফিরে এলে সেটিতে তিনি যেন সভাপতিত্ব করেন। তিনি রাজী হলেন। আমাদের তথ্য কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে তিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবেন, বললেন। কিন্তু জালাল ভাই জবাব দিলেন, 'এখন সরকারকে বলে একটা ঝামেলা বাধিয়ে লাভ হবে না। কারণ আমরা তো পতাকা তুলে অফিস করতে যাচ্ছি না। আমরা আপনার এখানে মাঝে মাঝে আসবো, লোককে বোঝাবো, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করবো কিছু প্রচারপত্র ছড়াবো, তাতে আপনাদের সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা চাই।'

কামাল জুমলাত রাজি হলেন। ও.কে.! আমরা স্বস্তির নি:শ্বাস ফেললাম। এতদিন পর আমাদের এই বিরাট সাফল্য।

কিন্তু বিকেলে ডেপুটি [এম.পি] মারুফ সা'দকে দিল্লী যাবার ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়ে যখন আলাপ করছিলাম ফোনে, তখন তিনি বললেন যে, 'আজ রেডিওতে খবরে বলেছে যে, একজন বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইজরায়েলে গেছে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের জন্য।' আমি প্রতিবাদ করে বললাম, এ হতেই পারেনা। তিনি বললেন, 'তোমরা কাগজে প্রতিবাদ করো।'

মহেন্দ্র বাবু সন্ধ্যা ৬ টার খবর শুনে জানালেন, 'ইট ইজ এবসোলিউটলি লাই। বাজে খবর। চেপে যান।'

সাংবাদিক নাবিলকে ফোন করলাম। নাবিল জানে না। সে সোশাল কলামে মারুফ সা'দ প্রদত্ত আমাদের সম্বর্ধনা সম্পর্কে খবর লিখেছে, জানাল।

১৬.৯.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে *লরিঅঁ লজুর* ও *ডেইলি স্টারে* দেখলাম ফলাও করে বেরিয়েছে খবরটা। অফিসে গিয়ে একটা প্রতিবাদমূলক বিবৃতি লিখলাম, জালাল ভাইয়ের নামে। সঙ্গে সম্পাদকের কাছে পত্র। পরে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম : হোসেন আলী এবং শেহাবুদ্দিনের কাছে–কোলকাতা ও দিল্লীতে। দারের সঙ্গে ফোনে আলাপ হলো। দার নিকোশিয়া থেকে বললেন, 'বিবৃতি দেয়া উচিত হবে না।' তাছাড়া, আমাদের দেশে ফিরে যাওয়ারও বিরুদ্ধে তিনি। সিরিয়া ঘুরে আসতে বললেন তিনি। কিন্তু এমতাবস্থায় সিরিয়া যেতে আমরা ভরশা পেলাম না। অন্য বন্ধুরাও মানা করলেন। কিন্তু এখানে থাকাও নিরাপদ মনে হচ্ছে না। তবুও থাকতে হবে। বিকেলে মহেন্দ্র এবং সাহনির সঙ্গে অনেক আলাপ হলো : ফিউটাইল এক্সসারসাইজ অফ ওয়ার্ডস [অকারণ বাক্য ব্যয়] হলো। ডিপ্লোমেটিক ডিজ অনেস্টি [কূটনৈতিক অসাধুতা] দেখে মনটা বিষিয়ে গেল। আমাদের মতামতের সততা, যুক্তিবত্তা এবং আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বন্ধুরা অনেকটা যেন উদাসীন মনে হলো।

আজ সকালে সাহানির লোকেরা আমার বেশ কয়েকটা চিঠি নিয়ে এসেছিল। এই প্রথম ডাক পেলাম সাত সপ্তাহের পর। দেশের খবর পেলাম পুরো পাঁচ মাস পর। ডলি [মিসেস রসুল নিজাম], মামি [মিসেস শামসুল আলম–চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারিক], সাইয়েদুল হক [আমার নিকটতম প্রতিবেশী, ইউ.এস.আই.এস–এর পরিচালক] এবং আমার স্ত্রীর দু'দুখানা পত্র! সব খবর জেনে মনটা যেমন খুশি হলো তেমনি এদিকে নিরাপত্তা [র অভাব], ফিরে যাবার ব্যগ্রতা, আজকের সন্ধ্যায় অন্তত ঘরে স্বেচ্ছাবন্দি থাকবার 'বোরডম ' প্রভৃতি, বর্তমান অবস্থানকে অসহনীয় করে তুললো।

১৭.৯.১৯৭১ শুক্রবার

সকাল বেলা *ডেইলি স্টারে* সেই স্বঘোষিত দূতের বিষয়ে দীর্ঘতর খবর পড়লাম। সেই তথাকথিত দূত–যার কোন পরিচয়পত্র নেই, সরকারের সঙ্গে এমনকি জনগণের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই– সে পনেরো বছর নাকি ইরানে কাটিয়েছে, নিজেকে ঢাকার লোক হিসেবে পরিচয় দেয়। ইরান থেকে তুরস্ক হয়ে জেনেভায় যায়–জেনেভা থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাহায্যে নাকি দিল্লীতে ছয় সপ্তাহ কাটায় সরকারি অতিথি হিসেবে এবং পরে তেল আবিব যায়–বাংলাদেশের সরকার এবং সংগ্রামীরা ...সুবিধা করতে পারছে না, যার ফলে সে অস্ত্র সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি করতে চায়। যাক, তার খবর পড়ে মনে হলো 'নকল দূত', একটু

আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু প্রতিবাদ প্রয়োজন। আজ মহেন্দ্র আমাদের পক্ষ নিলেন। কিন্তু সাহনি তাঁর মতামতে অনড়। যুক্তি-কুযুক্তির অন্ত নেই– মাহমুদ কাছিম যে দূত নয়, বাংলাদেশ যে তাকে পাঠায়নি তার প্রমাণ কী? না পাঠালে তার যেমন প্রতিনিধিত্বের অধিকার নেই, আমাদের কি তেমন কিছু আছে? ইত্যাদি। তাঁর মতে, আমাদের সরকারই প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু কোথায় সরকারি প্রতিবাদ? এদিকে সমগ্র আরব জনমত আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। সকালে আল-আওয়াম এবং আরব লীগের সঙ্গে যুক্ত ড. ক্লোভিস মকসুদের সঙ্গে ফোনে আলাপ হলো। তিনিও বিবৃতি চাইলেন। সন্ধ্যায় দিল্লী যাওয়া তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে যাচ্ছে। আমি আশ্বস্ত করলাম। তাঁর কাজিন জুমলাতের লোক রবার্ট হান্নার সঙ্গে পরিচয়– সে বেচারা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে গোস্বা হয়েছে বোঝা গেল। অবশ্য ভারত ভ্রমণের সুযোগ সে ছাড়তে চায় না তাও স্পষ্ট। তাকেও বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দিল্লীর বাংলাদেশ কনফারেন্সে পাঠিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় জালাল ভাই-এর সঙ্গে সাংবাদিক নাবিল বারাদির ফোনে আলাপ হলো। জালাল ভাই তাকে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। সে বললো যে, আরব জনমত আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। আমাদের বিবৃতি দেয়া দরকার। আজকেই। কিছুক্ষণ পর আমাকে ফোন করে জানালো যে, জালাল ভাইকে কথা দিলেও সে আসতে পারছে না। আমাকে আবার বিবৃতির কথা বলে এবং সংবাদ পত্রের জগতে আমাদের বিরুদ্ধে যে জনমত তোলপাড় হচ্ছে সেটি জানিয়ে দিল। আমি অনেক বোঝালাম : আজ অন্তত পনেরো বছর ধরে আমরা আরব জগতের সংগ্রামকে সমর্থন করে আসছি– আরব বন্ধুদের মনোভাব আমরা জানি। তবে এখন আমাদের সরকারের টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে, এই যা! সন্ধ্যায় কোথায় বেরুনো হলো না। শেহাবুদ্দিনকে ব্যাখ্যামূলক পত্র লিখলাম।

তারপর জালাল ভাইয়ের কাছে ছয় দফার জন্ম, তাঁর অগ্রজ প্রতিম শেখ মুজিবের নেতা হবার কাহিনী, আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিষয়ে কিছু ভেতরের ব্যাপার নিয়ে গল্প শোনা গেল।

১৮.৯.১৯৭১ শনিবার

আজ সকালে *লরিঅঁ লজুর* পত্রিকায় দেখলাম ফলাও করে খবর দিয়েছে : অঁদ্রে মাল্‌রো সংগ্রামী বাঙালিদের কাতারে শামিল হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। খুশিতে চোখে পানি এসে গেল। এই সাহিত্যিক দীর্ঘদিন ধরে আমার একজন হিরো। তাঁর সম্পর্কে কত পড়েছি! নোট করেছি অনেক (আছে কি আমার নোট খাতাগুলো?)। অনেক দিন ভেবেছি, আরো পড়াশুনা করে তাঁর সম্পর্কে লিখবো। তিনি বলেছেন : 'যুদ্ধবিদ্যায় আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা অন্য বুদ্ধিজীবীদের নেই। আমি সেটি

বাংলাদেশের কাজে লাগাতে চাই। আর বাংলাদেশের ব্যাপারে তাঁরাই কথা বলতে পারবেন যাঁরা তার পক্ষে লড়াই করতে প্রস্তুত (জয় প্রকাশ নারায়ণের কনফারেন্সকে কটাক্ষ!)। বাংলাদেশের উচিত, ভিয়েতনামের মত জবাব দেয়া– আমরা তো মরবোই কিন্তু তার আগে তোমাদের এমন শিক্ষা দেব যে পালিয়ে বাঁচতে হবে।'

বাংলাদেশের ওপর বিশেষ বক্তৃতা করতে তিনি রাজি নন। সেই বক্তৃতায় বড়ো জোর প্রবন্ধ রচনা করা যাবে। কিন্তু ততক্ষণে পাকিস্তান তার ট্যাংক বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন এবং সংগ্রামস্থলে যাবেন। বাহ্ বাহ্! বিখ্যাত *আন্-নাহার* পত্রিকায় সামির আতাউল্লাহ্ মারাত্মক এক 'কলাম' লিখেছেন 'বাংলাদেশের জন্ম', মালরোর বিবৃতির ওপর।[২৬]

মালরোর প্রস্তাব হচ্ছে : 'অন্য কিছুর চাইতেও স্বাধীন বাঙালি জাতির [অস্তিত্ব] প্রথম মানবিক সাক্ষর। শাসক শ্রেণীর কথার কোন দাম নেই। তাদের স্বীকৃতিও শুধু কথার ফুলঝুরি। এই নিঃস্ব জাতি রক্তচক্ষু নিয়ে যে স্বাধীনতা চাচ্ছে, তা আন্তরিক স্বীকৃতি সাপেক্ষ।'

ইংরেজি *ডেইলি স্টার* ছাড়া প্রায় সব আরব কাগজে মালরোর মন্তব্য, তার ওপর টিপ্পনী সহ বেরিয়েছে। স্টারে এবং অন্য কিছু কাগজে জাস্টিস আবু সাইদ চৌধুরীর বিবৃতি : 'ইজরায়েলে বাংলাদেশের দূত নকল এবং এই বিরুদ্ধ প্রচারণা গোয়েবলসকে হার মানায়–' বেরিয়েছে। যাক, তবু অন্তত কথা বলা যাবে এবার। অবশ্য মুখ তুলে আগের মতো কওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আমাদের বন্ধুরাই আমাদের এই অসুবিধায় ফেলে দিল। আমাদের মিশনের যে সাফল্য এবং ডিগনিটি সেটি নষ্ট করল। 'যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও নাকি সহ্য করতে হয়', গ্রাম দেশের কথা মনে পড়ল।

ভারতীয় কাগজে পড়লাম, ক'দিন আগে তারাশঙ্কর মারা গেছেন। [একজন যথার্থ মহৎ কথাশিল্পী ও বাংলাদেশের বন্ধু]। হুমায়ুন খান পন্নীর বিবৃতি উল্লেখযোগ্য এবং আরবীতে অনুবাদযোগ্য।

ফরাশি মহিলা ঔপন্যাসিক, 'নুভো রোমঁ–র (নিউ নভেল উপন্যাস, 'নব তরঙ্গ') অন্যতম প্রবক্তা নাথালি সারোতও মাল্‌রোর মত ভারতীয় সম্মেলন কর্তৃপক্ষকে লিখে বাংলাদেশের পক্ষে তাঁর সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিলেন [এই মহিলাকে ১৯৬৮ সালে মে-বিপ্লবের সময় আমি বক্তৃতারত দেখেছি প্যারিসে]। সার্ত্র প্রমুখ নিশ্চুপ রয়েছেন দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনিও এই জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

---

[২৬] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অবশেষে এই তো যথার্থ ফরাশি নাগরিক –যাঁরা সব সময় সংগ্রাম করেছেন স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের পক্ষে!

আজকের কাগজে মাহমুদ তুব্বু-র প্রেস কনফারেন্সের বিবরণও বেরিয়েছে। মাহমুদ দুজন ইতালীয় এম.পি.র সঙ্গে ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গের রিফিউজি ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শনের বর্ণনা প্রসঙ্গে পাকিস্তানীদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং 'বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেছেন। গতকাল সকালে মাহমুদ তুব্বুকে আমার ফোন করে শান্ত করতে হয়েছিল এই বলে যে, আমরা সব সময় আরবদের সাথে রয়েছি।

১৯.৯.১৯৭১ রোববার

সারাদিন প্রায় ঘরে বসে কাটিয়ে দেয়া হলো। পরবর্তী পর্যায় সম্পর্কে স্ট্রাটেজি ঠিক করা নিয়ে জালাল ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা ও পড়াশুনা করে দিন কেটে গেল।

২০.৯.১৯৭১ সোমবার

সকালে দার সাহেবের অফিসে গিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। এখান থেকে দু'জন যে পালিয়ে বেঁচেছে তা জানা গেল। বাকিরা এখনও ভাবনা চিন্তায় রয়েছে। পরে জানা যাবে।

তাকিয়েদ্দিন সোল, মিশেল আবু যোবায়ের-এর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা চালাতে হবে।

২১.৯.১৯৭১ মঙ্গলবার

সারাদিন কোথায় যাওয়া হলো না। তাকিয়েদ্দিন সোলকে ফোন করে হতাশ হতে হলো। আগামীকাল আবার করতে হবে। বিকেলে নন্দ কিছু খবর-কাগজের অনুবাদ নিয়ে এল। দার সাহেব আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাতে *আল ইয়োম* এবং *আল আনোয়ার*-এ আমাদের জন্য মারুফ সা'দের [আয়োজিত] সম্বর্ধনা এবং আমাদের বক্তৃতার উল্লেখ আছে। সাইদার সেই সন্ধ্যার স্মৃতি অনেক কাল জাগরুক থাকবে।

সন্ধ্যায় নাবিল বারাদির সঙ্গে আলাপ ও সান্ধ্যভোজন হলো আল-হাম্‌রা রেস্তোরাঁয়।

২২.৯.১৯৭১ বুধবার

সকাল আটটা থেকে চেষ্টা করে ন'টায় হিজ একসেলেন্সি তাকিয়েদ্দিন সোলকে পেলাম। উনি আগামীকাল দেখা করতে পারবেন। আজ মাউনটেন থেকে

উত্তরাঞ্চলে যাবেন। আগামীকাল বৈরুতে আসবেন। কিন্তু আগামীকাল সকালে আমাদের আর একটা বড় ধরনের রঁদেভু রয়েছে।

আজ অনেক কাগজ পড়লাম। ভারতীয়। ২০/২১ তারিখের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজে দেখলাম জয় প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে ড.এ.আর মল্লিকের এবং আব্বুর [সৈয়দ আলী আহসানের] ছবি। ভালো ছবিটি। আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ সম্মেলন খুব জমেনি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু [সেখানে যোগ না-দেয়ার কারণ দেখিয়ে] অঁদ্রে মাল্‌রোর বিবৃতি ও বেতার সাক্ষাৎকার বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই মালরোর কাছে একটা চিঠি লিখবো ঠিক করেছি। মুসাবিদা করলাম।

[আমার স্ত্রী নাসরীনের] চিঠি পেয়েছি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেননা এখনও ফিরে যাবার রাস্তা দেখছি না। জালাল ভাইয়ের প্ল্যান মত চললে কমপক্ষে আরো আটদিন!

সন্ধ্যায় নাবিল এল। কিন্তু প্রেস–যেখানে আমাদের পুস্তিকা ছাপা হবে সে সম্পর্কে কোন হদিস দিতে পারল না।

আগামীকাল, দম্যাঁ, মায়ঁনানা, বুখরা– টুমরো এ্যান্ড টুমরো!!

২৩.৯.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

আরব জননেতা সংযোগের সাফল্যজনক অধ্যায় হয়তো আজ থেকে শুরু হল। যে দুজন নেতার সঙ্গে আজ দেখা হল, তাঁরা যেভাবে আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন, বক্তব্য শুনলেন এবং 'সমাধানের' ইঙ্গিত দিলেন, কিছু ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন, তা সত্যিই আশাপ্রদ এবং অভাবনীয়। প্রথম জন হলেন রশীদ কারামে, ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা (তাঁর দলে বোধ হয় সাতাশ জন ডেপুটি রয়েছে), প্রায় দশ বছর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লেবাননের। সম্প্রতি পঞ্চাশোত্তীর্ণ, অকৃতদার, সুন্দর সুপুরুষ বলা চলে– লম্বাও না, বেঁটেও না, মোটাও না, পাতলাও না। নরম সুরে ফরাশিতে কথা বলেন। গৃহ সজ্জা ও বাগান রুচির পরিচয় দেয়। তাঁর নাকি হরিণ এবং জেব্রা ইত্যাদিও রয়েছে। আমরা অবশ্য কুকুর ও তোতাপাখি দেখলাম।

কারামে বললেন, বাংলাদেশে তিনি একবার গিয়েছিলেন–বুড়িগঙ্গার ওপর বোটে, রমনা পার্কে তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল। চট্টগ্রামেও বোধ হয় গিয়েছিলেন বললেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা শুনে তিনি অনেক দু:খ ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। (এই অমানুষিক বর্বরতার বিবরণ শুনে) এখন কী করা যায়? কাগজে যে 'নেগোচিয়েশানের' খবর বেরিয়েছে সেদিকে আমাদের আলোচনা করবার অবকাশ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন।

নিশ্চয়ই। তবে আলোচনা করবে কে? নিঃসন্দেহে তিনি, শেখ মুজিব। জেলে থেকে? না, মুক্ত হয়ে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে। তার আগে অবশ্য মিলিটারী রাজত্বের অবসান, কালা-কানুন সমূহের অপনোদন চাই।

কারামের মতে, এসব অসম্ভব কিছু না। এর ভিত্তিতে আলোচনা চালাবার জন্য তিনি পাক রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠাবেন। এবং পরে জানাবেন। আমাদের প্রেস কনফারেন্স এবং অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তাঁর পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলাপ করবেন। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ফোন করতে হবে।

রশীদ কারামে অভিজাত সুন্নী মুসলমান। আফেন্দী, পাশা তাঁদের পরিবারগত পদবী, তাঁর পিতা ত্রিপালির মুফতি। তাঁর দাদা লেবাননের গ্র্যান্ড মুফতি।

আধ ঘণ্টার মত আশা করে কারামের কাছ থেকে দেড় ঘণ্টার ওপর পাওয়া গেল। নানা আলাপ। তিনি অকটোবরে কিংবা নভেম্বরে কাশ্মীর ও বাংলাদেশ ভ্রমণে যাবেন। এটা ঠিক হল।

দুপুর একটার সময় তাকিয়েদ্দিন সোলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফরাশিতেই আলোচনা হলো। কিছু বয়স্ক, পুরনো ধরনের অভিজাত লিবারেল মনে হল। রশীদ কারামেকে যেমন, তাঁকেও তেমনি ফরাশিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। তিনি বললেন, এই অমানুষিক বর্বরতার কথা শুনে তাঁরা যে শুধু দুঃখ পেয়েছেন তাই নয়, তাঁদের বুকে শেলের মতো বিঁধেছে। 'মুসলমান এভাবে মুসলমানকে মারবে? জোর করে আনুগত্য, তথাকথিত সংহতি রক্ষা করতে চাইবে? এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আরব জাতিসমূহের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু করা সম্ভব ছিল না। আমাদের উপস্থিতি এবং ব্যাখ্যা প্রদান –এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করবে। তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে [আমাদের] সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি সবচে' মর্মাহত। কেননা পাকিস্তানকে একদা তিনিই আরব জগতে পরিচিত এবং জনপ্রিয় করতে সচেষ্ট ছিলেন। [বস্তুত, মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের জনপ্রিয়তার তিনিই প্রধান স্থপতি বলে দাবী করলেন] ১৯৪৬/৪৭ [সালে] তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন আরব লীগের পক্ষ থেকে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে যে, তাদের আলাদা হওয়া অনুচিত। তার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারতে এসে, সরেজমিনে সব দেখে, গান্ধীর ওপর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। এবং তাঁর লিখিত রিপোর্ট এবং প্রবন্ধাদিই সর্বপ্রথম আরবদের এ ব্যাপারে পথনির্দেশ দেয়। কিন্তু তাই বলে গোঁড়া তিনি নন। তাঁর

মতে, 'কখনো সংহতি, কখনো বিচ্ছিন্নতা জাতিসমূহের শক্তির কারণ হয়।' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তা' তিনি জানেন। তিনি এবং তাঁর ভাই মুসলমানদের মধ্যে লেবাননের স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম করেন। লেবানন, সিরিয়া, মৌরিতানির উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিলে আন্তর্জাতিক মুসলিম সংহতি বা আফ্রো-এশীয় সংহতি ক্ষুণ্ন হবে না বরং শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে কিনা একথা বিবেচনার সময় এসেছে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্মেলনে যেতে না পারার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত। নিমন্ত্রণ পেয়েছেন দেরিতে আর ডাক্তারের মানা ছিল। নইলে পরিবারের একজনকে অন্তত পাঠাতেন। সোল হলেন কারামের মত একজন প্রাইম-মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং, অপেক্ষমাণ প্রধানমন্ত্রী।[২৭]

[২৪–২৫ সেপ্টেম্বরের কোনো নতুন অভিজ্ঞতার কথা লেখা নেই ডাইরিতে]

২৬.৯.১৯৭১ রোববার

এর মধ্যে কিছু ফোন করা হলো। নাবিলের সঙ্গে অনেক আলাপ হলো। একরাত প্রায় না ঘুমিয়ে একটা প্রচার-পুস্তিকার টেক্সট তৈরি করলাম। নাম দিলাম–'সাফারিং হিউম্যানিটি ইন বাংলাদেশ'। নাবিল খুব প্রশংসা করল। জালাল ভাই ও দার সাহেব কিছু সাজেশান দিলেন। দার 'অপ্রয়োজনীয়, বিশেষ করে পাকিস্তান–বিরোধী বিবেচিত হবে এরকম কিছু অংশ বাদ দিতে বাধ্য করলেন। যাক, আরো চার-পাঁচটা পুস্তিকা তৈরি করতে হবে। পরবর্তী বিষয় ঠিক করলাম: 'শেখ মুজিব অর দা ভয়েস অফ জাস্টিস'। কিন্তু আমার পক্ষে আর এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ফিরে যেতে হবে। পাড়ি দিতে হবে পারী (প্যারিস)। দেশে চিঠি লিখলাম কয়েকটি। সন্ধ্যায় মোতাহার সাহেবকে ফোন করলাম। [মোতাহার সাহেব হলেন পাকিস্তানী দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা] আগামীকাল আবার ফোন করে একটা রঁদেভু স্থির করতে হবে।[২৮]

[আবার দু'দিন ২৭, ২৮ কোন কিছু লেখা হয়নি]

---

[২৭] যতদূর মনে পড়ে দুজনেই সত্তরের দশকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

[২৮] 'আমি ড. কবির, লন্ডন থেকে এসেছি। আপনার সঙ্গে একটা জরুরী বিষয়ে আলাপ আছে।' - এই বলে আমি কোনো রেস্তোরাঁয় বা তাঁর বাসায় রঁদেভু চেয়েছি। এমনকি পাকিস্তানীদের পক্ষ নিয়ে তিনি আমাকে বন্দী করবার ব্যবস্থা করলে আমাকে মুক্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা থাকলেও, একটা ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে দলে টানা যায় কিনা দেখার উদ্দেশ্যে ফোন করা। সৌভাগ্যবশত, পরে তিনি আর ফোন ধরেননি। তাঁর বাসার অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করাও যায় নি।

২৯.৯.১৯৭১ বুধবার

গত কয়েকদিন ধরে কেবল ফোন করা হচ্ছে। অফিসে গিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা ইত্যাদি।['তারের প্রতীক্ষা' ছিল ডাইরিতে : আমার ফিরে যাবার ব্যাপারে বা অন্য কোনো নির্দেশনা। আমার স্মরণশক্তির সাক্ষ্যে বলতে পারি যে, কোলকাতা বা দিল্লীর অফিস থেকে দীর্ঘ প্রবাস কালে আমরা কখনো কোনো নির্দেশনা পাইনি]।

তাকিয়েদ্দিন সোল বললেন, বাদশাহ ফয়সলের আগমনের কারণে সব গোলমাল হয়ে গেল। তিনি কিছু আলাপ করেছেন। তবে বিষুদবার আবার ফোন করলে লেবানীজ প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা জানা যাবে।

রশীদ কারামে বললেন, [পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, বাঙালি] রশীদ আহমদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে একবার বাদশা ফয়সলের রিসেপশনে। রশীদ আহমদ হুঁ হ্যাঁ করতে চাইলে কারামে বললেন যে, তাঁকে এখন বিবৃতি দিতে হবে। পরে রশীদ আহমদ তাঁর কাছে গেলে তিনি নেগোসিয়েশনের ব্যাপারে অর্থাৎ শেখ মুজিবের মুক্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে সে প্রস্তাব করেছেন। এবং ওখান থেকে জবাব আসতে দিন দশেক লাগবে। দেখা করতে চাইলে আগামী সপ্তাহে ফোন করতে বললেন। তবে আগামী সপ্তাহের পরের সপ্তাহে এলে কিছু জানা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে আদনান হাকিমের সঙ্গে একটা রঁদেভু হয়ে ভেস্তে গেল। নাবিলের চেষ্টায় অনেক কাল পর তাঁর পাহাড়ের বাড়ির ফোনে তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল। পরের দিন রঁদেভু দিলে আমরা তাঁর অফিসে গিয়ে দেখি, তিনি চলে গেছেন বাদশাহ ফয়সলকে 'রিসিভ' করতে। আদনান হাকিম নাজাদে পার্টির নেতা। সুন্নী মুসলমান, তাঁর পার্টি আমাদের মুসলিম লীগের মত। কিন্তু আমাদের তো সবার কাছে ধর্না দিতে হবে। এটা নাকি কূটনৈতিক মিশনের অঙ্গস্বরূপ!

দিল্লী কনফারেন্স-ফেরত কামাল জুমলাতের 'প্রতেজে' (অনুগ্রহভাজন) রবার্ট হান্নার সঙ্গে আলাপ হলো। নরম স্বভাবের উকিল হান্না বললেন, কনফারেন্স ভালোই হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, প্রধানত তাঁদের মূখপাত্র এবং তাঁর কাজিন ক্লোভিস মকসুদের মারফতে। এছাড়া হান্না তাঁদের পার্টি পত্রিকা *আল-আমরা*-র জন্য প্রবন্ধ তৈরি করছেন। [তিনি রিফিউজি ক্যাম্প, মুক্ত এলাকায় যখন যাননি তখন এখানে প্রেস কনফারেন্সের জন্য আর পীড়াপীড়ি করা যায় না। বুধবার দেখা করবার কথা অফিসে। এলেন না। [আমার লেখা]

নাবিল অনুবাদ করে নিয়ে এসেছে 'সাফারিং হিউম্যানিটি ইন বাংলাদেশ'–এর। ভালোই হবে মনে হয়। ও নিজে খুবই উৎসাহী। আমার মূল টেক্সট এবং

নিজের আরবী অনুবাদ দুটিরই প্রশংসামুখর। তার সম্পর্কে তার প্রাক্তন কর্তা ওয়াফিক তিব্বি আর আমাদের অভিমত প্রায় একই : পার্টস আছে। তবে একটু....। তাও নির্ভর করা যায়।

মি. ফারিস গ্লব, গ্লব পাশার ছেলে, সি.বি.এস তথা কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের বৈরুত অফিসে ইনচার্জের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হলো। ২৫ শে মার্চ সে ঢাকায় ছিল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দু'একবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তার নিজের কথায়, সে যখন ঢাকায় গিয়েছিল তখন পঞ্চাশ ভাগ 'প্রো-পাকিস্তান' ছিল। তারপর যখন ফিরল তখন পেশাগত নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও সে অনেকটা বাংলাদেশ-সমর্থক হয়ে ফিরেছে। সে সি.বি.এস-কে রাজী করাতে পারে, আবার ফিরে যাবার জন্য–যদি বাংলাদেশ সরকার তাকে মিলিটারি অপারেশন ইত্যাদি ফিল্‌ম্ করার সুযোগ দেয়। আগামী সপ্তাহের শেষে জবাব দিতে হবে। ওকে পরিচয় করিয়ে দেয় অল ইন্ডিয়া রেডিও-র বৈরুত প্রতিনিধি। তাঁকে কিছু ব্রিফ করে দিলাম।

গতকাল থেকে ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, আমি বিষুদবার চলে যাব। ডেফিনিট। আজ আবার সেটি ভেস্তে গেল। জালাল ভাই একা থাকবেন? 'কোনো কাজ হবে না। টু ডেঞ্জারাস!'-দার সাহেবের উক্তি। আবার আমাকে রোববার অবধি থাকবার পক্ষে মত দিতে হল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা জালাল ভাই উৎসাহিত হয়ে নাবিল আর এ.আই.আর. -এর সান্নিধ্য লাভের আশায় আগামীকাল চলে যাবার পক্ষে বললেন। দেখি, কাল সকালে ফোন করে ব্যবস্থা হয় কিনা। এক বিতিকিচ্ছি পরিস্থিতিতে পড়া গেল। দার সাহেব রাজি হবেন কিনা, শেষ অবধি ফিরে যাওয়াই সম্ভব হবে কিনা, কে জানে? এখন রাত্র প্রায় তিনটা। এবার ঘুমিয়ে পড়া যায় কিনা , সে চেষ্টাই করা যাক।

৩০.৯.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

সকাল বেলা অফিসে ফোন করলাম। কর্তা বললেন, 'মাই ডিয়ার, আপনার নাম ওয়েটিং লিস্টে ছিলো। গতকাল আবার রোববার যাবেন সে কথা বলা হয়েছিল। আই ডোন্ট থিংক, [এখন কোন] রিজার্ভেশান পাওয়া যাবে।' আসল কথা, উনি চান না যে, আমি জালাল-ভাইকে ফেলে চলে যাই। পরে আবার সে কথা হলো : শনিবারের মধ্যে খবর না এলে জালাল ভাইও চলে যাবেন।

কিন্তু জালাল ভাই বললেন, 'না, আমি ঠিক করেছি– থাকব। অফিস সেট-আপ করবো। ডক্টর [অর্থাৎ আমি] গিয়ে কাউকে পাঠাবেন বা খবর দেবেন। যদি কেউও না আসতে পারে ১০ দিন দেখে আমিও চলে যাব। ও.কে!

আরব জগতের রাজনীতির গতিধারা, ভারত-বাংলাদেশের সমস্যা–আন্তর্জাতিক তৌলদণ্ডে বিচার করা হলো।

বিকেল বেলা হোটেল বদলিয়ে আল-কাযার-এ এলাম। হোটেল স্যাঁ জর্জ আর ফোনেশিয়া ইন্টারকনটিনেনটালের মাঝামাঝি। টুরিস্ট এলাকায় নাইট ক্লাব ডিস্ট্রিক্টের পাশে। সমুদ্রের ওপরে। ভালো। হোটেল মালিকের তরফ থেকে দু'জনের জন্য দু'ঝুড়ি ফল পাঠিয়ে দিল। খুব ভালো লাগলো এই অপ্রত্যাশিত আতিথেয়তা!

তাকিয়েদ্দিন সোল, রবার্ট হান্নাকে ফোন করে পেলাম না। প্রফেসর যিয়াদের সাথে রঁদেভু ঠিক করা হল। নাবিল এলে কিছু আলোচনার পর চীনা রেস্তোরঁয় খেতে গেলাম। অনেক দিন পর। একটু হতাশ হতে হলো।

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো পড়ে বোঝা যায়– গত সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পেয়েছে তিনটি বিষয় : ব্যবসায়ীদের ওপর প্রস্তাবিত কর, ডিউটি ইত্যাদির ব্যাপারে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ যে আইন করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী তাতে মনে হয়, দেশ ও দশের উপকার হতো। কিন্তু দেখা গেল, অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীদেরই জয় হলো।

নাসেরের স্মৃতিকে সাম্প্রতিক আরব ঐতিহ্য থেকে বাদ দেবার ষড়যন্ত্র চলছে মনে হয়। নাসের-এর মৃত্যু বার্ষিকীর দিন ঠিক এসে হাজির হলেন বাদশা ফয়সল। বৈরুত সফরের জন্য তিনি যেন আর সময় খুঁজে পেলেন না। গোলমাল হবার আশংকা করা হচ্ছিল। কিন্তু না– পয়সা যার জোর তার, মুলুকও তার। ফয়সলের পয়সা সর্বত্র ছিটানো হচ্ছে। লেবাননেও ছিঁটেফোটা পড়ছে। তাই কোনো গণ্ডগোল হলো না। সংবাদপত্রগুলো থেকে শুরু করে সবাই জমকালো অভ্যর্থনা জানালো। নাসের স্মৃতিবার্ষিকী একটু ধামাচাপা পড়ে গেল। অবশ্য ভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি আর কোরআনখানি হলো। *লরিঅঁ লজুর* সাদাৎ সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছে মনে ধরার মতো। সেটি ক'দিন থেকে আমারও মনে হচ্ছিল। সাদাৎ নাসেরের ঐতিহ্য নিয়ে নয়, স্বকীয় ক্ষমতায় 'রৈস' [নেতা] হতে চান। নাসেরের সমাজবাদ বিসর্জন দিয়ে কিংবা একপাশে রেখে ইসলামী মতবাদের দিকে নাকি তিনি ঝুঁকেছেন। ঠিক ইসলামী না হলেও এটা বোঝা যায় যে, মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের জিগির দেয়া হচ্ছে। কিছুটা পরোক্ষে। সেজন্য পাকিস্তানী প্রচারণার একটি বিশেষ সমাদর হচ্ছে সেখানে। পাকিস্তানের অস্তিত্ব, সংহতি এবং স্বৈরাচারী সরকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে অবহিত হয়েও তাকে সমর্থন করবার নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় অনেকে মেতে রয়েছেন, এটি খুবই দুঃখজনক।

বাংলাদেশের পক্ষে অস্ত্রধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফরাশি সাহিত্যিক ও প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী মাল্‌রো যে বিবৃতি দিয়েছেন তা নিয়েও নানা মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। দু'একটি ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আরব বুদ্ধিজীবীদের (হয়তো কিছু ফরাশিদেরও) অন্তসারশূন্যতা সুপ্রকট হয়ে পড়ছে।

১.১০.১৯৭১ শুক্রবার

সকাল ৯টায় বৈরুতের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক যিয়াদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। ইতিমধ্যে আমাদের সম্পর্ক যথেষ্ঠ আন্তরিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। অবশ্য আব্বুর [আমার শ্বশুর সাহেবের] কারণেই। তবে যিয়াদে আমার সম্পর্কে, বিশেষ করে বৈরুতের কাজ সম্পর্কে খুবই উচ্চকণ্ঠ, প্রশংসামুখর। তিনি বললেন, আপনি থাকতে না পারলে কাজ কি ভালোভাবে চলবে? অবশ্য আপনার শ্বশুরকে পাঠাতে পারলে খুবই ভালো হয়। আমি বললাম, দেখি, কর্তাদের বলবো। তাঁর কাছ থেকে স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আরো একটু জ্ঞান আহরণ করা গেল। বিশেষ করে, মুসলিম রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে। শুধু মুসলিম নয়, সুন্নী মুসলিম। প্রধান মন্ত্রীর পদ যাঁদের একজনের জন্য নির্ধারিত। রশীদ কারামে নাকি সুন্নী বলে এবং বাপের নাম ভাঙিয়ে এতদিন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাকিয়েদ্দিন সোলকে দিয়ে [প্রস্তাবিত] এ্যারাব ফ্রেন্ডস ফর বাংলাদেশ সোসাইটি করতে পারলে ভালো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দেরও এর সদস্য হতে আপত্তি নেই।

সাড়ে ১০টায় অফিসে গিয়ে দার সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হলো। তাঁর ইচ্ছে তাকিয়েদ্দিন যদি প্রেসিডেন্ট নাও হতে পারেন অন্তত তাকে পৃষ্ঠপোষক হতে রাজী করাতে হবে। এর পর ক্লোভিস মকসুদকে বা জুমলাতের পার্টির কাউকে সেক্রেটারি করলে চলবে। ড. ওমর আবু রিশেরা তো আছেনই।

সকালে-বিকালে অনেকবার ফোন করে অবশেষে তাকিয়েদ্দিন সোলকে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, ফয়সলের সফরের জন্য প্রেসিডেন্ট বা তার বন্ধুদের সঙ্গে কন্টাক্ট করা সম্ভব হয়নি। আগামী মঙ্গলবার বারোটার দিকে তাঁকে তাঁর শহরের বাগান বাড়িতে পাওয়া যাবে। তখন কথা হবে। তথাস্তু। তাঁকে আর বললাম না যে, মঙ্গলবার অবধি আমি থাকবো না।

শুক্রবার, আগের লেখা, নতুন লেখা পনেরো খানা চিঠি (দেশে-বিদেশে) সমাপ্ত। সেগুলো সব আজ হোটেলে পোস্ট করতে দিলাম। আশা করি, ব্যাটারা ফাঁকি দেবে না। আমার বুকিং হয়ে গেছে। রোববার সন্ধ্যায় বৈরুত ছেড়ে চলে যাব। অবশেষে!

ফিরে যাব যখন, কিছু বাজার-সাজার করি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব তো মেলা। কার জন্য কী কিনি? মহা মুশকিল! তাড়াহুড়ো করে ফিরতে হলো (দোকান পাটও প্রায় বন্ধ)। কেননা বম্বের ব্রিটিজ প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলাপ হলো।

৩.১০.১৯৭১ রোববার

সকালবেলা দার সাহেবের বাসায় গিয়ে দীর্ঘ আলাপ হলো। শরণার্থীর সংখ্যা, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়, কূটনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদির নানা প্রসঙ্গে আমাদের ভাব বিনিময় হলো। আরব জগতে আমাদের প্রচার কার্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। আর আরব জগতের সমর্থন অন্তত নিরপেক্ষতা ব্যতিরেকে, মনে হচ্ছে, বৃহৎ শক্তিবর্গের কেউ আমাদের পক্ষাবলম্বন করবে না। সুতরাং প্রচার কার্য চালাতেই হবে।

সন্ধ্যা বেলা নাবিলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। তাকে আপাতত মাসিক ৫০০ পাউন্ডে নিয়োগ করা হলো। সে আমার বিদায় উপলক্ষে তার নতুন 'রেসিডেন্সে' খুব যত্ন করে খাওয়ালো। তার বান্ধবী হামা পাকা-গিন্নী স্বভাবের মেয়ে। রাত আটটায় যে প্লেন ছাড়বার কথা ছিল, তা বিলম্বে আসছে। প্রথমে শোনা গেল রাত এগারোটায়। পরে একটায়। বারোটায় এয়ারপোর্টে আসা গেল। অবশেষে ভোর চারটায় প্লেন ছাড়লো। অবিশ্বাস্য! বৈরুত ছেড়ে রওনা হতে পারলাম, তাহলে!

দিল্লী প্রত্যাবর্তন

৪.১০.১৯৭১ সোমবার

চার ঘণ্টার মতো ফ্লাইট। দিল্লীর সময় দুপুর বারোটায় পালাম বিমান বন্দরে অবতীর্ণ হলাম। আড়াই ঘণ্টা লাগলো 'ফর্মালিটিজ' সেরে বেরিয়ে আসতে। ভাগ্যিস, আমার কোলকাতা যাবার বুকিং বিকেল সাড়ে পাঁচটার ফ্লাইটে হয়ে গেল।

শেহাবুদ্দিন, ফ্রঁসোয়া দরে[২৯]-কে ফোন করে পেলাম না। ট্যাক্সি নিয়ে শেহাবুদ্দিন সাহেবের বাসা-কাম-মিশনে গিয়ে হাজির হলাম। অত্যন্ত কোল্ড রিসেপশান ভাগ্যে জুটলো। আসলে তিনি ছিলেন অসুস্থ! জিগ্যেস করলাম, 'ডিপ্লোম্যাটিক সিকনেস' কিনা! ডিপ্লোম্যাটিক হাসি উপহার পেলাম। ওঁরা (আমজাদুল হক সহ) পাক মিশন থেকে সদ্য আগত একজন টাইপিষ্টকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তবু মনে হয়, একটা কিছু বিশেষ রহস্য আছে যা আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল। [এখানে কয়েকটা পংক্তি আমি পূবাহ্নেই কেটে দিয়েছি, কেন এখন আর মনে নেই] সেখানে আগত আরেক অতিথি চট্টগ্রাম পোর্টট্রাষ্টের ডাক্তার কামাল. এ.খানের কাছ থেকে চাটগাঁর ভালোমন্দ বেশ কিছু খবরাদি পেলাম।

জেরার ভিরাতেল-কে ফোনে খোঁজ করে পেলাম না। পরে ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে অল্প কথাবার্তা সেরে বিমান বন্দরে চলে গেলাম।

প্লেনে এবং পরে দমদম থেকে সুইন-হো স্ট্রীট অবধি সাথী হলেন ড.জে চক্রবর্তী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক। ভ্যাংকুবারে শেক্সপীয়ার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ফিরে আসছেন। প্লেনে অন্য সহযাত্রী ছিলেন ডা. কনক সেন। ঢাকা জেলার লোক। ১৯৪০ সাল থেকে অনেকদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন। বড় মামা ও নানা কামরুজ্জামান সহ অনেককে তিনি চেনেন।[৩০]

---

[২৯] দরে হলেন, ফরাশি দূতাবাসের শিক্ষা উপদেষ্টা। আমার আসন্ন প্যারিস যাত্রার যোগাযোগ তাঁর সঙ্গেই ছিল।

[৩০] বড় মামা ডা. ক্যাপ্টেন আবুল কাসেম তখন আওয়ামী লীগের এম.পি.এ এবং তাঁর সহপাঠী ও আত্মীয় ডা. কামরুজ্জামান হলেন নাট্যকার মমতাজউদ্দীন আহমদের শ্বশুর এবং সম্পর্কে আমাদের নানা।

কোলকাতা আবার : আসল যুদ্ধ এবার

[সুইনহো স্ট্রীটের] বাসায় এসে পৌছুলাম রাত সাড়ে ৯টায়। যা আশংকা করেছিলাম–নাসরীন নেই। স্নান সেরে [শ্যালক] মেহরাবকে সাথে নিয়ে চললাম আব্বুদের বাসায়। ডি.আই.টি এভিনিউ-এর পাশে গোবরা রোডে। ট্রেন লাইনের এপাশে বাসা আর ওপাশে নাকি নকশালপন্থিদের ডেরা।

বৈরুত থেকে ফিরে কোলকাতাকে এত গরীব, দীন-দরিদ্র শহর মনে হচ্ছে যে, মুহূর্তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। জীবনটাই এখানে বিবর্ণ। যদিও পূজা আর শবেবরাতের জন্য কিছু হৈ-হুল্লোড়, বাজি ফুটানো ইত্যাদি এখানে-সেখানে চলছে, তবুও মনে হচ্ছে এসবের মধ্যে আনন্দোল্লাস নেই, যান্ত্রিক আদিম প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি শুধু রয়েছে। কেমন ভয় ভয় করে। বাজি না বোমা? ট্যাক্সিটা চলছে যেন গরুর গাড়ির চাইতেও মন্থর গতিতে। শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন। তিন মাসের কাছাকাছি আমাদের দু'জনের ছাড়াছাড়ি। তাই প্রেমালাপেই রাতভোর!

৫.১০.১৯৭১ মঙ্গলবার

সকাল এগারোটার দিকে গেলাম বাংলাদেশ মিশনে। পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী নেই। [ব্যারিস্টার] মওদুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ হলো। আলম সাহেব এলে তাঁর অফিসে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে তিনি নানা কাগজপত্র দেখলেন। খুব প্রয়োজনীয় মনে হলো না। অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কার্টুনের কাটিং পরীক্ষা করছেন, কোথাও সই দিচ্ছেন। আমি সামনে বসে রইলাম। নিশ্চুপ।

[পররাষ্ট্র মন্ত্রী] খোন্দকার মোশতাক আহমদের বাসার ঠিকানা যোগাড় করা হলো। আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। আলম সাহেবকে বললাম : 'আপনি তো ব্যস্ত রয়েছেন, আমি না হয় পরে আসি।'

–'পরে আর দেখা হবার সুযোগ নেই। আমি কাল চলে যাচ্ছি।'

অগত্যা অপেক্ষা করতে হলো। আরো কিছুক্ষণ পর সংক্ষেপে বৈরুত মিশনের পজিটিভ রেজাল্ট সম্পর্কে বলতে হলো। আমার বিদেশ যাবার পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করলেন। কাগজপত্রের ব্যাপারে হোসেন আলী সাহেবের সাহায্য নিতে বললেন।

সন্ধ্যাবেলা মিনিস্টারের রুমে ঢুকতেই তিনি খুব উচ্চকণ্ঠে ইংরেজিতে আমার তারিফ করতে লাগলেন। ভূমিকাস্বরূপ বলছিলাম, তাড়াহুড়োর জন্য যাবার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর কাছে পরিচিত হবার সুযোগও ঘটেনি। প্রায় কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন : 'গুণের পরিচিতি শুধু কি চেহারা চেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ? আপনার গুণের কথা আমি এত শুনেছি যে আপনাকে আপনার লোক হিসেবে ভেবে এসেছি। এতে আমি গর্ববোধ করছি ...এই যে দেশের জন্য আপনি যা করে এলেন...' ইত্যাদি।

আমি কিছুক্ষণ বাকহারা হয়ে রইলাম। লজ্জা হলো নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে আর অক্ষমতার কথা স্মরণ করে। সামলিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে সব কথা বললাম। মুশতাক সাহেবকে খুব এলার্ট এবং ইনটেলিজেন্ট[৩১] মনে হলো। ইজরায়েলে বাংলাদেশের তথাকথিত দূতের গমন প্রসঙ্গে যখন হাইপোতেটিকেলি বলছিলাম, 'যদি ইজরায়েলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়ও আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে প্রতিবাদ করতে চাইছিলাম।' কিন্তু মাঝখানে তিনি বললেন : ' ক্যান উই? ক্যান উই এ্যাফোর্ড টু হ্যাভ রিলেশনস উইদ ইজরায়েল?'

আমার খুব ভালো লাগলো। ধৈর্য্য সহকারে তিনি আমার সমস্ত বক্তব্য শুনলেন। আমি অবশ্য সংক্ষেপেই বললাম। তিনি একটি রিপোর্ট দিতে বললেন। জালাল ভাইয়ের চিঠিখানা পড়লেন। লাল কালিতে দাগালেন, কিছু নোট লিখে রাখলেন। বললেন : ঠিক আছে। আপনি ফ্রান্সে গিয়ে বাংলাদেশ সেন্টার খুলে দেন।

পরে চাষী সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি নোটটি দেখে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করলেন। আমাকে কিছু সম্মানী দেবার ব্যবস্থা হয়েছে [৩০০ রুপি মাত্র!]। সেটি আবার রিপোর্ট লেখার জন্য, এ কথা উল্লেখ থাকলো।

৬.১০.১৯৭১ বুধবার

ফ্রেন্স ব্যাংকে গিয়ে জানলাম যে, আমার টাকাটা ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে মনি-অর্ডারে। [প্যারিস থেকে বাংলার অধ্যাপক] ফিলিবের সাহেব টাকা পাঠিয়ে ছিলেন। শেষ অবধি এটি পাব কিনা, কে জানে।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ –কোলকাতার ডিরেক্টর খুব ভালো লোক, দেখলাম। অনেক খাতির করল। ফ্রান্সে আমার বহু কাজ করবার বিষয় রয়েছে বলল। বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে তাহলে অসুবিধা হবে না? Tant mieux (So much the better)! তাছাড়া আমাকে ছাত্রবৃত্তি নয়, অধ্যাপকের হার দেওয়া হবে, জানালো।

৭.১০.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

হোসেন আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। জালাল ভাইয়ের কথা ঠিক। ভালো-মন্দ যাহোক, হোসেন আলী সাহেবের এপ্রোচ প্র্যাকটিক্যাল মনে হলো।

[এখানেই আমার মুক্তিযুদ্ধের মিশন নিয়ে লেখা মূল ডায়েরীর পরিসমাপ্তি। ১৯৭১-এর ডায়েরীটিতে তারিখ মোতাবেক আরো কিছু ভুক্তি আছে। সেগুলোর

---

[৩১] [তখনও আমি মন্ত্রীসভার মধ্যে মতানৈক্য এবং খোন্দকার যে প্রায় 'ক্ষমতাচ্যুত' –সেসব বিষয়ে অবহিত ছিলাম না।]

উদ্ধৃতি দিচ্ছি এখানে সরকারি সংযোগের বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। মোল্লা জালাল বৈরুতে আমাকে তিনটি চিঠি দিয়েছিলেন :

১. সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

২. খোন্দকার মোশতাক আহমদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী

৩. মাহবুবুল আলম চাষী, পররাষ্ট্র সচিব।

একবার লিখতে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে আর লিখলেন না।

আমার ডায়েরীতে উল্লেখ না থাকলেও স্মরণে আসছে যে, খোন্দকারের কাছে যাবার আগে আমি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বাসায় গিয়েছিলাম এবং তাঁকে জালাল ভাইয়ের চিঠি দিলাম, আরব জগতের খবরাখবর জানালাম এবং চা খেলাম। সেজন্য পরে খোন্দকার সাহেবের কাছে গেলে তিনি চা খাওয়াতে চাইলেও আর চা খেলাম না। কোলকাতার একটি বড় দালানের এক-একটি এপার্টমেন্টে ওঁরা থাকতেন। রাষ্ট্রপতির সচিব থাকতেন আমার শ্বশুরের পাশের ফ্লাটে। তাঁর স্ত্রী হলেন, আমার বন্ধু ফজলে হাসান আবেদ (বর্তমানে স্যার আবেদ, ব্র্যাক-প্রধান)-এর কাজিন। এই ঘটনার কয়েকদিন পর ঈদ উপলক্ষে আমি সস্ত্রীক তাঁদের দুজনের বাসায় যাই। পরে আমাদের আর কোন যোগাযোগ থাকেনি। তবে কয়েকদিনের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা একটি রিপোর্ট আমি জমা দেই। এ সময়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের অন্যতম কর্মকর্তা আনোয়ারুল করিম চৌধুরী জয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে]।

৩১.১০.১৯৭১ রোববার

[ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের মিস অরুন্ধতি ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি শরণার্থী/স্টেটলেস পারসন হিসেবে ছাড়পত্র নিয়ে প্যারিসে যাবার উদ্দেশ্যে]। ফেরার পথে শান্তি কমিটির সম্পাদক আলী আকসাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

২০.১১.১৯৭১ শনিবার

ঈদ! ঈদ-আল ফিতর! শরণার্থীর ঈদ। সেদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাসায় আমরা বিশেষভাবে আপ্যায়িত হয়েছি। মিসেস ইসলাম আমার স্ত্রীর প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁদের এক ছেলের সঙ্গে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর ছেলে ভাষণকেও দেখেছিলাম তাঁদের বাসায়]

২১.১১.১৯৭১ রোববার

সন্ধ্যায় দিলীপ মালাকারের বাড়িতে ডিনার। প্রধান অতিথি মসিয় আদুকি, কঙ্গো-ব্রাজাভিলের প্রতিনিধি, পরে প্যারিসে থাকবেন। [এই ডিনারে বাংলাদেশ মিশনের আনোয়ারুল করিম জয় ও বিড়লার গৌতমদা ও তাঁর স্ত্রী যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে]।

২২.১১.১৯৭১ সোমবার

[চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সহকর্মী] ড. আনিসুজ্জামানের ফুফু মিসেস সালমা চৌধুরীর কাছ থেকে খবরবার্তা নিয়ে ডা. আনোয়ারা খাতুনের চেম্বারে গেলাম আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের গৌর মজুমদারও আমাকে তাঁর কথা বলেছিলেন। উজ্জ্বল শ্যাম, বিশেষ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহিলা, বিলাতী ডিগ্রী সম্পন্ন গাইনি চিকিৎসক আমাকে আকৃষ্ট করলেন অন্য কারণে। তাঁর বসবার টেবিলের বিপরীতে দেখলাম, বিশাল আকারের একটি ছবি, পরিচিত তবে ছোট আকারে, শেরে বাংলা আর রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। সামনে ফলাহারের বিপুল আয়োজন।

২৬.১১.১৯৭১ শুক্রবার

[একটি অপরাহ্নের কথা ডায়েরীতে লেখা নেই। দিল্লী থেকে এসে জেরার ভিরাতেল কি করে জানি না আমাকে ধরে ফেলল। যথারীতি পার্ক স্ট্রীটে একটি রেস্তোরঁয় আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে একত্র হলাম। একথা-সেকথার পর জেরার আমাকে জানাল যে, 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে।' ওর কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ রয়েছে]।

২৭.১১.১৯৭১ শনিবার

সুনীল দাশের আর্ট একজিবিশানে এলাম দ্বিতীয়বারের মত। এবার সহধর্মিনী সমেত। সুনীলের রং রেখা আর কল্পনার বৈশিষ্ট্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি আধুনিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে পুরোনো তাত্ত্বিক পর্ব, ছবি কিংবা সাংকেতিক রেখাগুলো অতিক্রম করে। নতুন একটা তাত্ত্বিক তাৎপর্য নির্মাণ করতে পেরেছে। প্রদর্শনীতে [বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পৃথিশ নন্দী, রীনা নন্দী, কে.জি (কেশব গাঙগুলি) প্রমুখের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। সুনীল আমাদের একটি ছোট ছবি উপহার দিলো]।

২.১২.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

গতকাল সন্ধ্যায় পৃথিশ নন্দীর নিমন্ত্রণ ছিল। পৃথিশ-রীনার ডিনারে সমীর ঘোষ ও ডা. গণির সঙ্গে পরিচয় হলো।

[দিল্লী থেকে আগত লোকনাথ ভট্টাচার্যও ছিলেন। এই বাড়িটি হলো ৫ নম্বর পার্ক এভিনিউতে। রীনাদের বিপরীতে থাকেন সৈয়দ মুজতবা আলী। আর দোতলায় থাকেন ডা. গণির ছোটভাই আবু সয়ীদ আইয়ুব]।

খাওয়া-দাওয়া আলাপ-বিতর্ক চললো অনেকক্ষণ ধরে। রাত সাড়ে এগারোটায় ডা. গণি আমাদের বাসায় পৌঁছে দিলেন। ফেরার পর আমরা স্বামী-স্ত্রী পরচর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। নিজেদের সমস্যা ও সুযোগ সম্পর্কেও মতবিনিময় চলছে। দেড়টার দিকে নাসরীনের হঠাৎ শরীর খারাপ লাগতে শুরু করলো। ডাক্তারের দেওয়া বাচ্চা হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ছিল ১৬ ডিসেম্বর। যাহোক, আধা-তলা নেমে নিচে গিয়ে কড়া নাড়লাম। সিমাব উঠে মা-মনিকে জাগিয়ে দিয়ে [...] বাড়িওয়ালার দারোয়ানকে ডেকে তুলে ফোন করে ক্লিনিককে জানলাম : ওরা নিয়ে যেতে বলল। ওদিকে ড. আনিসুজ্জামানকেও ফোন করা গেল। [উনি আগে ভাগে বলে রেখেছিলেন, প্রয়োজনে জানাতে। গাড়ি চালিয়ে দ্রুত চলে এলেন আনিস-ভাই। ডাক্তার দেখে বললেন : 'ঠিক সময়ে এসেছিলেন। এখন যান। কাল সকালে আসবেন। ভয়ের কারণ নেই।'

সকাল সাড়ে ন'টায় আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম ক্লিনিকে। তখন বাচ্চা হয়ে গেছে। 'মাই গুডনেস!'

মা ও বাচ্চা সুস্থ। ভয়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। ওরাই বলল :

'ছেলে হয়েছে। সকাল ৮.১৮ মিনিটে। যান, দেখে আসুন।

ফুটফুটে বাচ্চাটা দেখে ভালোই লাগলো। অপারেশন টেবিলের ওপর ঘর্মসিক্ত নাসরীন আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। ও যে সুস্থ আছে, সেটাই সে মুহূর্তে সবচে' বড় মনে হলো।

৩.১২.১৯৭১ শনিবার

[এই দিন উদভ্রান্ত মানসিকতায় কয়েক লাইন লিখেছি ইংরেজিতে। এখানে বাংলা তজমাই তুলে দিচ্ছি] : বাবা হবার বড় মহিমা যেমন, তেমনি সমস্যাও কম নয়। কে জানি বলছিল, পরিবারে আরেকজন মুক্তিযোদ্ধার জন্ম হল। ফরাশি কনসাল জেনারেল মসিয় বেরনার অবশ্য বলে উঠলেন, 'আশা করি, তা হবে না। এ অবস্থা অত দীর্ঘ সময় চলতে থাকবে না আর সে হবে একজন মন্ত্রী! তার বাবা তো এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশার প্রান্তদেশে রয়েছেন।

মসিয় আদুকিও শুনে খুব খুশি হলেন। সিমাবকে নিয়ে আমি কিছু কেনাকাটায় বেরুলাম। বেবীফুড পাওয়া মুশকিল। অবশেষে একটা পাওয়া গেল। সান্ধ্য পরিদর্শনে মা ও শিশুকে দেখতে গিয়ে দু'জনকে আরেকটু সুস্থ মনে হলো।

৪.১২.১৯৭১ শনিবার

গতকাল বিকালে ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতায় এক জনসভায় বক্তৃতা করলেন। এই সভাতে নাকি ন্যূনপক্ষে বিশ লক্ষ লোক হয়েছিল। মিটিং-এর পর তড়িঘড়ি মিসেস গান্ধী দিল্লী চলে গেলেন। রেডিওতে ঘন ঘন ঘোষণা করা হলো যে, তিনি সত্বর একটি জরুরি ভাষণ দেবেন। অনেকক্ষণ পর তিনি জানালেন যে, বিকালে পশ্চিম ভারতে বিভিন্ন জায়গায়– আম্বালা, আগ্রা, পূর্ব পাঞ্জাবে পাকিস্তান বিমান আক্রমণ করেছে। ভারত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে এবং পাল্টা আক্রমণ করবে।

অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এরপর প্রতিদিন পাকিস্তানের বিমান, ট্যাংক ধ্বংস ইত্যাদি সম্পর্কে কিন্তু বেশির ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে– ঘাঁটি বেদখল হবার কথা, শোনা গেল। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হানা দিয়ে, বিমান আক্রমণ করে এবং আমাদের নৌবাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানীদের পর্যুদস্ত করতে লাগল। অতঃপর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একত্রে বাংলাদেশ থেকে হানাদার বাহিনীকে শেষ আঘাত হানতে শুরু করল।

সন্ধ্যায় জয় করিমের সঙ্গে মি. সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ডিনার খেতে গেলাম। চমৎকার আয়োজন ছিল। প্রচুর খেলাম। অনেক আলাপ। অন্যান্য অভ্যাগতদের মধ্যে ছিল ড.ও মিসেস দিলীপ মালাকার এবং মি. বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশুর বিনয় চৌধুরী। অনেক কাল আগে তিনি *মুসলিম রাজনীতি ও ভারত* শীর্ষক একটি কাজ করেছিলেন (ডবলু. সি. স্মিথ–এর বইতে রয়েছে উক্ত কাজের রেফারেন্স)। মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও একজন ইতিহাসের গবেষিকা ও অধ্যাপিকা।

৬.১২.১৯৭১ সোমবার

আজ দুপুরে জানা গেল, ইন্দিরা গান্ধী এক ঘোষণায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই উপলক্ষে কোলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় এমন কি রাস্তা-ঘাটে, বাসায় তুমুল আনন্দ-উৎসব লক্ষ্য করা যায়।

১৪.১২.১৯৭১ মঙ্গলবার

আজ ক'দিন ধরে কাগজে ভারতীয় বাহিনীর বিজয়ে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভারতীয় বিশেষজ্ঞ দলের ঢাকা যাবার খবরে আমাদের ছাত্র-বুদ্ধিজীবি মহলে চাপা অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। সর্বত্র এই নিয়ে আলোচনা চলছে। আমার অবশ্য মনে হয় না, কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু করবেন যা বাংলাদেশের জনগণের ওপর বোঝাস্বরূপ মনে হবে। তবে হুযুগে পড়ে, ব্যবসায়িক স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে, বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু পর্যটক যাবেন। অস্থায়ী বসবাসকারীও আসতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে মৌরসী পাট্টা করতে আসবেন না। আসা উচিত নয়।

এখন থেকে বোঝাপড়া এভাবে হলেই মঙ্গল।

১৫.১২.১৯৭১ বুধবার

ক'দিন ধরে কেবল যুদ্ধ পরিস্থিতির আলোচনা চলছে। জয় অনিবার্য! বিশ্বের বড় বড় পাণ্ডারা জাতিসংঘে ভারত ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছে। আমেরিকা তার সপ্তম নৌবহরের গতি ফিরিয়ে নাকি বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত করেছে। আশ্চর্য! আমেরিকা! তবে আজকালের মধ্যে হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

আজ সকালে ফ্রেঞ্চ টেলিভিশন টীমের প্রধান মসিয় কঁসেস, ফটোগ্রাফার ওবেরতাঁ এবং একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার-এর সঙ্গে বেনাপোল অবধি গেলাম। মাঝপথে এবং বিভিন্ন ব্যাক-গ্রাউন্ডে আমার চার-পাঁচবার ইনটারভিউ নেওয়া হলো বাংলাদেশ পরিস্থিতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা।

[ফরাশি কনসাল জেনারেল এবং ব্যরিস্টার মওদুদের অনুরোধে আমি গিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। এরজন্য কোন সম্মানী ওরা দিতে চেয়েছে কিনা মনে নেই। তবে আমি নিই নি বা নিতাম না, এটা ধ্রুব]।

আরেকটা কথা, বেনাপোলের কাছে একটা পুকুর পাড়ে একটা লোক ডাব পাড়ছিল। আমরা বিক্রি করবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে চারটি ডাব আমাদের খেতে দিল এবং কিছুতেই দাম নিল না। আসলে এই ছিল তখনকার দিনের স্পিরিট!

এঁরা ছাড়াও লব্‌সেরভাত্যর-এর মসিয় এল্‌দ্ (Held), ল্য ফিগারোর- মাদাম উগুয়েৎ দিবেসস্যো প্রমুখ আরো কয়েকজন আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন কোলকাতায়। অবশ্য সুযোগ পেলেই আমরা বলতাম : মুজিব নগরে আছি।

১৮.১২.১৯৭১ শনিবার

ইংরেজিতে সংখ্যাবাচক কিছু তথ্য রয়েছে–যুদ্ধে ভারতের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত। সম্ভবত এটা মন্ত্রী জগজীবন রাম ভারতীয় পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। ৭১-এ যুদ্ধে ভারতের প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির একটি হিসাব কোনো রেফারেন্স ছাড়া আমি নোট করেছিলাম।

বাংলাদেশ একশানে ভারত হারিয়েছে	নিহত	আহত	নিখোঁজ
"	১০৪৭	৩০৪৭	৮৯
পশ্চিমা ফ্রন্টে	১৪২৬	৩৬১১	২১৪৯
বস্তুগত ক্ষতি	৪৫ এয়ারক্রাপ্ট	৭৩ ট্যাংক	১ ফ্রিগেট

বাংলাদেশের পুর্নর্নির্মাণে খরচ হবে ৬৫০ কোটি রুপি।

১৯.১২.১৯৭১ রোববার

আজকের খবর : অন্তত বিশজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে মোহম্মদপুরের কাছে। অদৃষ্টের পরিহাস, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীও এই নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন। মুক্তি ফৌজের ছেলেরা, স্বয়ং মুনীর ভাইয়ের বড় ছেলে নাকি তাঁকে সাজা দেবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল। তাঁর অপরাধ : পূর্বে ও পরে তিনি ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানীদের পায়রবি করেছেন। সে যা হোক, তাঁর মতো প্রতিভাবান অধ্যাপক, লেখক এবং বক্তাকে কোনো কড়া শাস্তি দেবার পক্ষপাতি আমি কোনদিনই হতে পারতাম না। কিন্তু নৃশংস পাকিস্তানীদের স্বার্থেই তাঁর এবং আরো অনেক অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীকে গুলি করে বা অমানুষিক অত্যাচারে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে আরো রয়েছেন আমার শিক্ষক মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী। তাঁর মতো শান্ত-শিষ্ট, সাহিত্যানুরাগী মানুষ কম দেখা যায়। শান্তিনিকেতনে তিনি ছিলেন লোকনাথদা'র সহপাঠী। এঁদেরকে মাত্র গত সপ্তাহে মুখোশধারী আততায়ীরা এসে তাঁদের বাসা থেকে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের সব জায়গায় মিলে প্রায় হাজার খানেক বুদ্ধিজীবীকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

আত্মসমর্পণের আগে পাক সেনা ঢাকা স্টেট ব্যাংকের ৪ কোটি টাকা বিনষ্ট করে দিয়েছে বলেও খবরে প্রকাশ।

২০.১২.১৯৭১ সোমবার

বাংলাদেশের খবর খুবই আশংকাজনক। ঢাকায় এবং অন্যত্র এখনো গৃহযুদ্ধ এবং অরাজকতা চলছে বলে জোর গুজব। চট্টগ্রামের কোনো খবর নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হবে, তাঁকে চীনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া সন্ধ্যায় জানা গেল, ভুট্টো প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত।

২১.১২.১৯৭১ মঙ্গলবার

কী সৌভাগ্য! বৈরুত থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অবতার কৃষ্ণ দার ও জালাল ভাইয়ের অভিনন্দন-বার্তা পেলাম টেলিগ্রামে। তবে সেটা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কারণে নয়, আমার পিতৃত্ব অর্জনের জন্য!

২২.১২.১৯৭১ বুধবার

ইংরেজিতে বাংলাদেশের ওপর বিবিসি–র একটি তথ্যচিত্র সম্পর্কে আলোচনা।

অপরাহ্ণে ২টা বিশ মিনিটে সম্প্রচার হলো আমার বেতার-কথিকা। গতকাল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তা'বাণীবদ্ধ হয়েছিল। [যতদূর মনে পড়ে, এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এককালে চট্টগ্রাম কলেজে আমার সহপাঠি বেলাল মোহাম্মদ]। কী আশ্চর্য, বিগত ২ ডিসেম্বর (২০১৫) ধমণীর হাইডেলবার্গে বক্তৃতা করতে গেলে সে সময়কার বেতার কর্মী আবদুল্লাহ-আল ফারুখের সাক্ষাৎ ঘটে।]

ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজের মন্তব্য : এক বার্গলার তথা চোর-বদমাশের বদলে এবার সুবিধাবাদী একজন এখন পাকিস্তানের ক্ষমতায়!

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম কামারুজ্জামানের বিবৃতি : 'বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ এবং তাই থাকবে যতদিন পদ্মা ও মেঘনা এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবে।'

বিকেল ৪.৪৫ মিনিট বাংলাদেশ সরকার মুজিব নগর থেকে ঢাকা পৌছুল এবং প্রবলভাবে সম্বর্ধিত হল।

২৩.১২.১৯৭১ বৃহস্পতিবার

[ঢাকা। ২১জানুয়ারী ১৯৭২ সালে লেখা এই তারিখের পৃষ্ঠায় আগের ঘটনা]।

শরণার্থী জীবনের শেষ ক'দিন অসম্ভব উৎকণ্ঠায় কেটেছে। কবে ফিরবো? এর পরে নববর্ষের দিনটিও কেটে গেল অলক্ষ্যে।

ক'দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ, লন্ডনে অবস্থান এবং প্রত্যাবর্তন নিয়ে আমাদের আনন্দ আর উৎসাহের অন্ত নেই। খুশিতে অনেকের চোখে পানি এসে যায়।

২৭.১২.১৯৭১ সোমবার

এইদিন আমাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী উপলক্ষে আমার শ্বাশুড়ীর উৎসাহে আমরা একটা ছোটখাট সান্ধ্যানুষ্ঠানের আয়োজন করি। কোলকাতার যেসব বন্ধুর বাড়ীতে খেয়েছি তাঁরা সবাই ছিলেন। বাইরের বাংলাদেশীদের মধ্যে শুধু আনোয়ারুল করিম জয় উপস্থিত ছিলেন। দেশে ফেরার ব্যস্ততায় পরিচিত আপনজনদের তখন পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আর্থিক সঙ্গতির কথা বাদ দিলেও প্রধানত স্থানাভাবের কারণে আমাদের অতিথির সংখ্যা ছিল হাতে-গোনা।

স্বাধীন স্বদেশ

ঢাকা : স্বচ্ছ ও সুন্দর

কোলকাতা থেকে ঢাকা ফেরা সে-এক ইতিহাস বটে! বাংলাদেশ মিশনে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বুকিং দেয়া হয়েছে। প্রথম সচিব রফিক সাহেব দিন দশেক পর আমাদের পরিবারের দশজনের টিকেট দিতে পারলেন। বাকি চারজনের আরও তিনদিন পর। আমরা ১০ জানুয়ারী প্রথম দশজনের জন্য ঠিক করলাম। ১৩ জানুয়ারী ফিরবেন আব্বু, মা-মনি, সিমাব ও চম্পা খালা। মেহ্‌রাব ওর বন্ধুদের সঙ্গে স্থলপথে চলে গেছে।

সকাল সাড়ে ৭ টায় বাসা থেকে রওনা দিয়ে দমদম পৌছে এক দফা ফিরে আসতে হলো। জানা গেল, বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ফিরছেন। সুতরাং আমাদের যাত্রা বিলম্বিত হবে। এয়ার লাইন্সের অফিসের কাছে বন্ধু ড. দিলীপ মালাকারের বাসা। বাচ্চাসহ স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতে গেলাম। পরে বিকালে বিমানে উঠব–দেখি, লাইনে আছেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচমেট এনাম চৌধুরী। তিনি জরুরি মিশনে দিল্লী গিয়েছিলেন। এখন ঢাকা ফিরে যাচ্ছেন। আমার কোলে এক মাস আট দিনের পুত্র পূষণকে দেখে তাঁকে খুব কৌতূহলী মনে হল। এর মধ্যে প্লেনের ভেতর আমাদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। ঢাকা থেকে নাকি সবুজ বাতি দেখানো হচ্ছে না। যাহোক, অবশেষে সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা এসে পৌছুলাম।

তেজগাঁ বিমান বন্দরে নেমে বাবলু মামার সহাস্য অভ্যর্থনা সবাইকে মুগ্ধ করলো। বৃষ্টি-ধোয়া স্নিগ্ধ শহর ঢাকাকে যে কী অপূর্ব লাগছিল তা বর্ণনা করা যাবে না। দু-তিন তলা উঁচু ইমারতসমূহ পেরিয়ে গোপীবাগ এসে পৌঁছুতে মনে হয়েছিলো যেন, এক স্বপ্নপুরীতে এলাম। মামার রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা যাবতীয় বিষাদ ও শ্রান্তি দূরে সরিয়ে রাখলো। অন্যদিকে তাঁর পরিবারের দুলহিন মামী, ইলমান, সঞ্জু ও বুলবন সবাইকে আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত রাখল। সবার চোখে পানি, ঠোঁটে হাসি-এ এক অপূর্ব দৃশ্য!

সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ে টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা আগমন, রেসকোর্সের সভা প্রভৃতি দেখে ও শুনে গোপনে চোখ মুছলাম। একদিন কি দু'দিন পর ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকার শুনলাম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। সে এক অসাধারণ অনুষ্ঠান বটে।

পরদিন দৈনিক বাংলায় ফোন করে কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমাদের পরিচয় দীর্ঘকালের। ১৯৫৪ সাল থেকে। তিনি গোপীবাগ

এলেন, মুক্তিযুদ্ধের মিশন-ফেরত এক অনুজপ্রতিমকে দেখতে। অবশ্য একটা বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কোলকাতার বিশিষ্ট কবি ও অনুবাদক পৃথিশ নন্দীর কবিতার বই দেবার ছিল তাঁকে এবং জানানোর প্রয়োজন ছিল যে, নন্দী রাহমানের আরো কবিতা অনুবাদ করতে চান।

অবশেষে ১৩ জানুয়ারী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ফিরলেন তাঁর পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে। তিনি উঠলেন ভাগ্নে ফজলে রাব্বির বাসায়। সে বাসার নাম 'অশ্রুময়'। হোসেনী দালানে তাঁর ছোটভাই আলী রেজা সাহেবের বাসার সামনে।

চাটগাঁয় আমাদের গ্রামের বাড়িতে রাখা তাঁর গাড়িখানা আমার ছোট ভাই জহির শাহ্ কোরেশী বাটালি হিল-টপে নিয়ে রেখেছিল। সেই সময়ে ভাঙ্গাচোরা রাস্তা দিয়ে কিভাবে যেন সে সেটাকে ঢাকায় নিয়ে এল। আর আমি সেই গাড়ি চালিয়ে তাঁকে বাংলা একাডেমি নিয়ে গেলাম। তখনকার পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী কবীর চৌধুরী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সম্বর্ধিত করলেন একটি বক্তৃতা-সভার আয়োজন করে। দৈনিক বাংলায় ফোন করে হেদায়েত হোসেন মোর্শেদকে আনালেন বঙ্গ আহসানের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। সম্ভবত পরদিনই সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে চাটগাঁ থেকে এলেন বড় মামা ক্যাপ্টেন ডা. আবুল কাসেম। তিনি আওয়ামী লীগের সংসদ-সদস্য। বেয়াইকে তিনি বললেন যে, তাঁর অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। আরও কেউ কেউ তাঁকে সে কথা বলেছেন। দু'জনকে গাড়িতে বসিয়ে পরদিন, ১৭ জানুয়ারী আমি গণ ভবনে নিয়ে গেলাম।

গণ ভবন আঙ্গিনায় গাড়ি নিয়ে ঢুকতে তেমন কোনো বিপত্তি দেখা গেল না। কিন্তু তা দেখা গেল আমার পুরোনো বন্ধু ও সহপাঠী, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহ-বাসিন্দা, তখন বঙ্গবন্ধুর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীর বরফ-শীতল ব্যবহারে। একটি স্লিপে সাক্ষাৎপ্রার্থী তিন জনের নাম লিখে দিলে তিনি আমার নামটি কেটে দিলেন। অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে তাঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হলাম যে, ক'দিন আগে বিদেশ–বিভুঁয়ে বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি ও জীবনরক্ষার জন্য মোল্লা জালাল ও আমি প্রায় জীবন বিসর্জনের পথে গিয়েছিলাম। যাহোক, বড় মামা ও শ্বশুর সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। লম্বা করিডোরে অগুণতি ভারতীয় ও দেশি দর্শণার্থীদের সঙ্গে আমি বসে রইলাম।

একটু পরে বঙ্গবন্ধু সেখানে এসে দ্রুত সবাইকে–'কেমন আছেন? ভালো? এ্যাই তোরা কেমন আছিস?' ইত্যাদি সম্বোধনে, প্রায় বিদ্যুৎ চমকিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আধঘণ্টার ওপর ভেতরে থেকে শ্বশুর ও মামা বেরিয়ে এলেন। জানলাম, অধ্যাপককে আর চট্টগ্রামের কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে হবে উপাচার্যরূপে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কবি মোহম্মদ মনিরুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রী রাশেদা জামানের সৌজন্যে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। স্ত্রীকে নিয়ে একবার মিসেস মুনীর চৌধুরীকে সালাম জানিয়ে এলাম। কয়েক দফা লাঞ্চ ও ডিনার ছাড়াও মনি আমাদের সেলিম আল-দীনের একটা নাট্যানুষ্ঠানেও আপ্যায়িত করেছিলেন, মনে পড়ে। নাটকটির ভাব-গাম্ভীর্য ও অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

একদিন ফরাশি কনসুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। কন্সাল-জেনারেল পূর্ব-পরিচিত। তিনি আমার সমস্ত সার্টিফিকেটের একটি এলবাম সংরক্ষণ করছেন। চট্টগ্রামে ফ্রান্সের অনারারি কন্সাল রসুল নিজাম তাঁকে দিয়েছেন আমাকে প্যারিসে পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু আমি তো দেশেই ফিরে এসেছি'খন। তাই এলবামটি নিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে একটি সাহায্যকারী সরকারী টিম এলো প্যারিস থেকে। তারা আমাকে জিগ্যেস করলো: 'এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচে' বেশি প্রয়োজন কী– খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র, পোষাক–কী?' নিজের অবস্থার কথা ভেবে কিনা জানিনা, আমি স্বতঃফূর্তভাবে বলে ফেললাম: 'এখন সবচে' প্রয়োজন যোগাযোগ ব্যবস্থার সমাধান, তার উপকরণ সংগ্রহ।' আমি জানিনা, কীভাবে কী হলো : পরে দেখা গেল, ফ্রান্স বাংলাদেশকে বহু সংখ্যক ট্রাক উপহার দিলো।

মিরপুরে আমার ছোট বোন লিলি ওরফে হোসনে আরা ও তার স্বামী সৈয়দ বদিওল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা। বহু কষ্টে মধ্য-ষাটে ওরা যে একটা বাড়ি করেছিল বিহারীরা তা' সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়েছে। অদম্য উৎসাহে স্বাধীন ঢাকায় তারা বিহারীদের পরিত্যক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক বাড়ি নিয়ে আর-এক নতুন জীবন শুরু করেছে।

এর মধ্যে এসে গেল ঈদুল-উল-আযহা। বাংলা একাডেমির সামনে মাঠে বসেছিল গরুর হাট। সেখান থেকে বাবলু মামা এক বিশাল সাদা ষাঁড় কিনে নিলেন। সেবার খুবই আনন্দমুখর ঈদ্দোজ্জোহা উদযাপিত হলো।

সব তো ভালোই হলো। কিন্তু চট্টগ্রামের কর্মস্থলে যাই কী করে? ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বাচ্চা নিয়ে যেতে সবাই মানা করলেন। মাসের ওপর ঢাকায় কাটিয়ে তাই ঠিক হলো আমরা নদী ও সমুদ্র পথে যাবো। বাবলু মামা ছিলেন অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থার সচিব। স্বভাবতই একটু বিশেষ ব্যবস্থা হলো। উপরের কেবিন রিজার্ভ থাকল। জাহাজের সমস্ত লোকজন খাতির-যত্নে তটস্থ। বিকালে নারায়ণগঞ্জ থেকে রওনা দিয়ে পরদিন সকালে চট্টগ্রাম পৌঁছুব। বন্দরের কাছে এসে কিছু সমস্যা দেখা গেল। বিদেশী কিছু জাহাজকে নির্দেশনা দিতে হলো মাইন পোতা রয়েছে সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে এবং আমাকে তা মাইকে, ইংরেজিতে বলতে হলো আমাদের জাহাজের সারেঙের অনুরোধে। আমাদের সঙ্গে ছিল দুলহীন মামীর প্রস্তুত এন্তার সুখাদ্য। সে যাত্রায় সহকর্মী নাট্যকার জিয়া হায়দারকেও পেয়েছিলাম সঙ্গী হিসাবে।

চট্টগ্রাম : নতুন পথে

স্বাধীন ঢাকার কর্মমুখর পরিসর ছেড়ে আমরা এলাম চট্টগ্রাম। সদরঘাটের কাছেই ভিড়ল আমাদের জাহাজ। সেই কবে ছেলেবেলায় আমরা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মায়ের সঙ্গে হাওয়া খেতে আসতাম। সেখানে ছোট ভাই জহির শাহ কোরেশী (খোকন) একটা বড় গাড়ি নিয়ে আমাদের নিতে এলো। সে তখন পি.ডবলু.ডি-র একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার বস এক বিহারীর (সম্ভবত এ.জি.আনসারি) সঙ্গে সে বাটালি হিল-টপে অবস্থান করছিল। দিন কয়েক আগে সেই বিহারীটি হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। পরিত্যক্ত কিছু বইপত্র দেখে মনে হলো বেশ পড়াশুনা জানা লোক ছিল।

বাটালি হিল-টপ এক অপূর্ব সুন্দর পর্বত-শৃঙ্গের একগুচ্ছ বাসভবনের সমাহার। এ রকম আর দুটি জায়গা আমি চট্টগ্রামে দেখেছি। একটিতে শিল্পপতি এ.কে.খান ও তাঁর বড় ছেলে জহির উদ্দিন খানের দুটি বাসভবন। অন্যটিতে তাঁর জামাতা জনাব এম.আর সিদ্দিকীর বাড়ি যা ধ্বংস করবার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যথেষ্ট গোলাবারুদ খরচ করেছিল বলে শুনেছি। বর্তমানে ঐ ভবন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা ক্রয়-সূত্রে ন্যাশনাল ব্রোকার্সের অথবা আমার ভগ্নীপতি রসুল নিজাম ও তাঁর সহকর্মী হাকিম পরিবারের সম্পত্তি। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শহরের কাছে অবস্থিত পি.ডাব্লিউ.ডি-র এলাকাটি ছিল অতি মনোরম।

এখানে বাবার ইন্তেকালের পর আমার মা গ্রাম থেকে এসে ১০বছরের ওপর অবস্থান করছিলেন খোকনের সঙ্গে। পরে ভাইটি হালি শহরে বাড়ি করে চলে যাবার সময় এলে তাঁর স্থান-ত্যাগে প্রবল অনীহা দেখা দিল। মাত্র দু'দিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা ও মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমি রাজশাহী চলে গেলে তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ তাঁকে আর বাটালি হিল ছেড়ে অন্য বাসস্থানে যেতে হলনা।

ঢাকা থেকে ফিরে এখানে আমরা কয়েকমাস অবস্থান করি। প্রায় বিকেলে বহু পর্যটক ও কিছু সিনেমা পরিচালককে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত। এর মধ্যে বাটালি থেকে নেমে লাল খাঁ বাজারের মোড়ে একটি জেনারেল স্টোরে একদিন আমার স্ত্রীর বান্ধবী এবং আমার ফরাশি ক্লাসের ছাত্রী বিহারী মেয়ে আরজু-র সঙ্গে দেখা। কথা প্রসঙ্গে সে এক অতি আজগুবি তথ্য পরিবেশন করল : জহির রায়হানকে বিহারীরা মিরপুরে মেরে ফেলেছে বলা হয়, যা তার মতে ঠিক নয়।

আসলে তিনি নাকি এখন সশরীরে লাহোরে আছেন। এ প্রসঙ্গে পরে আর কোন কথা শুনিনি বা সত্যাসত্য বিচারের অবকাশ ঘটেনি।

অল্পদিনের মধ্যে আবার সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়লাম। বিভিন্ন স্মরণিকার জন্য লেখা, এমনকি একটা সরকারি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থাকা, কক্সবাজারে একটি বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবুল ফজলের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বক্তৃতা করা, শহরে মুসলিম ইনস্টিটিউটে 'আবহমান বাংলা ও বাঙালি' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীতে নতুন উপাচার্য ড.ইন্নাস আলীর সঙ্গে মঞ্চে অবস্থান ও বক্তৃতা প্রদান উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর অন্যতম।

চট্টগ্রামে ফিরে দেখলাম, আমার ও স্ত্রীর কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র কিছুই খোয়া যায়নি। বাবা ও কাজের ছেলে আব্দুল জলিলের তৎপরতায় ওগুলো রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে একাধিক স্থান পরিবর্তনের সুবাদে বিদেশ থেকে সংগৃহীত কিছু মূল্যবান গ্রন্থ, বহু সৌখিন সামগ্রী, এবং সবচেয়ে প্রিয় কয়েকটি গানের রেকর্ড (এল.পি. ৩৩ ও ৪৫) উধাও হয়ে গেছে-যার শোক এখনো ভুলতে পারি না। দু'চারটি ফার্নিচারও গেছে-যার জন্য কোন দুঃখ নেই।

বর্ষাশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটা ছোট ডুপ্লেক্স বাসা পাওয়া গেল-এস.ই-১৩। সারিবদ্ধ বাড়িগুলোতে একপাশে থাকতেন ড. আনিসুজ্জামান, অন্যপাশে অধ্যাপক মোহম্মদ আলী, ইংরেজি বিভাগ প্রধান ও তাঁর স্ত্রী খালেদা হানুম, বাংলার শিক্ষক। সেখানে ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ আমাদের প্রথম সন্তান নাবিল শাহ কোরেশী ওরফে পূষণের প্রথম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হলো খুব ধুমধামের সাথে।

অল্প পরে উপাচার্য ড. ইন্নাস আলী আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে স্যার এ.এফ.রহমান হলের প্রভোস্ট নিযুক্ত করলেন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকেই আমি বাংলা বিভাগের রীডার এবং ফরাশি ভাষার শিক্ষক ছিলাম। তিনি আমাকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভাষা বিভাগ-প্রধান পদটিও গ্রহণ করতে বললেন। ১৯৭৩ এর গোড়ার দিকে প্রভোস্টের জন্য নির্ধারিত একটা বড় ডুপ্লেক্স ভবনে (৮ নম্বর) আমি চলে এলাম। তখন আমার পাশেই ছিল শিল্পী রশীদ চৌধুরীর বাসা ও তাপিশ্রী কারখানা। সেখানে অন্তত দু'বার শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এসে সস্ত্রীক থাকলেন। শিল্পী কামরুল হাসানও এলেন। আমাদের পাশাপাশি প্রায় লাগোয়া বাসা। তাছাড়া রশীদের ফরাশি স্ত্রী ও যমজ দু'কন্যার কারণে আমরা এক পরিবারের মতই ছিলাম। শিল্পাচার্যের সঙ্গে একবার আমরা কাপ্তাইয়ে তাঁর ভায়রার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখনও মনে পড়ে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা, বিশেষত তাঁর রসিকতাপূর্ণ নানা কথাবার্তা।

এ সময়ে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে এক প্রদর্শনীতে শিল্পপতি এ.কে খান একটি আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা ও অর্থ সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেন। আমি আলিয়ঁসের প্রতিষ্ঠাতা–প্রেসিডেন্ট, তাই প্রধান অতিথি শিল্পাচার্য জয়নুল ও শিল্পী রশীদ চৌধুরীসহ তাঁর জায়গা পরীক্ষা করলাম। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে সরকারি কর্তৃতাধীন একটি পরিত্যক্ত বাড়ি চাইব এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর অতিথিরূপে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক এবং শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে বিশ্বে সুপরিচিত ফরাশি মনীষী অঁদ্রে মাল্‌রো বাংলাদেশে এলে তাঁকে দিয়ে আমাদের প্রস্তাবিত কলাভবন তথা চিটাগাং আর্ট গ্যালারি এন্ড ফোক মিউজিয়াম–এর দ্বারোদঘাটন করাবো। বঙ্গবন্ধু প্রায় ঘণ্টাখানেক আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং চট্টগ্রামের ডিসি কে যথাযথ আদেশ দিলেন। শিল্পী রশীদ, তাঁর সহকর্মী দেবদাস চক্রবর্তী, মিজানুর রহীম ও অন্যান্যদের নিয়ে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত বাড়িটি সুন্দরভাবে একটি জাদুঘরের উপযুক্ত করে তুললেন। চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল সবিহ উল-আলমও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এক মনোজ্ঞ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হলো সেদিন। মাল্‌রো সহ সবাই ছিল আনন্দে উদ্‌বেলিত। সর্ব পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করা হলো বারবার।

এখানে উল্লেখ করা হলো না: এর আগে আমি ঢাকা ও রাজশাহীতে মাল্‌রোর দোভাষীরূপে তাঁর কাছাকাছি ছিলাম। চট্টগ্রামে অনবদ্য অনুষ্ঠানমালার পর আমরা কাপ্তাই হ্রদে ও রেস্ট হাউসে এক অবিস্মরণীয় সময় যাপন করি ফরাশি বন্ধুদের সঙ্গে।

একই বছরে ফরাশি সরকারের আমন্ত্রণক্রমে শিশুপুত্রসহ তিন মাসের জন্য প্যারিসে যাবার সুযোগ ঘটে আমার। এটা ছিল আসলে মুক্তিযুদ্ধকালীন পলিটিক্যাল এসাইলামস্বরূপ আমার স্ত্রী ও আমার জন্য এক বছরের বৃত্তির পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থাপনা। কেননা তখন আমার পক্ষে বেশিদিনের জন্য বিদেশে অবস্থান অসংগত হবে বলে মনে হয়েছিল। যা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। তখন ঢাকায় এসে শুরু হলো আমার চক্রাকারে ঘোরাফেরা। প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার, ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণ করে প্রধান মন্ত্রীর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রাপ্তি। তখন সাবেক মন্ত্রী এবং বৈরুতে আমার অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী জালাল ভাইয়ের স্মরণাপন্ন হলাম। মোল্লা জালাল আমাকে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর দরবারে হাজির করতে চাইলেন। কিন্তু ভীড়ের কারণে তা সম্ভব হলো না। তিনি সচিব রফিক-উল্লাহ চৌধুরীকে সে দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এবার দেখা গেল চৌধুরীর আচরণ অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু তবুও কাজটি তিনি সমাধা করলেন তাঁর

অধীনস্থ অনু ইসলামের মারফত। অবশ্য প্রধান মন্ত্রীর আসন্ন জাতিসংঘ সফর নিয়ে তাঁকে তখন ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল।

প্যারিসে এক ফরাশি যুবক বাংলাদেশের জন্য ঔষধপত্র পাঠানোর দাবিতে একটা বিমান হাইজ্যাক করতে গিয়েছিল। সে সময় অঁদ্রে মাল্‌রো তার পক্ষে স্বাক্ষ্যদানরত। যাহোক, আমি ভেরিয়ের ল্য বুইস্‌সোঁ-র নীল সালোঁতে তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টার ওপর আলোচনায় বসবার সুযোগ পেলাম। আমার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের সমাদরের জন্য তাঁর বান্ধবী মাদাম সফি দ্য ভিলমোরাঁর সঙ্গে তিনি ভিন্ন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। মাল্‌রো তিনটি ব্যাপারে আমাকে আশ্বস্থ করলেন :

১. চীন আর আমাদের বিরুদ্ধে যাবে না। জাতিসংঘে আমরা আসন পাবো।
২. বাংলাদেশে ফরাশি সাহায্য অব্যাহত থাকবে।
৩. প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কোর্স প্রত্যাহার করা হবে না। (এ ধরনের আশংকা জানিয়ে প্রফেসর ফিলিবের আমাকে লিখেছিলেন যাতে আমি মাল্‌রোকে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানাই। উল্লেখ্য যে, ফিলিবের ও আমি ১৯৬৪-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহায্যক্রমে এই কোর্স চালু করতে সমর্থ হই)।

তিন মাস প্যারিসে গবেষণাকর্ম শেষে এক সপ্তাহ বর্দো, এক সপ্তাহ মাদ্রিদ ও তলেদো ভ্রমণ করে আমরা লন্ডনে গেলাম। সেখানে আমার ও শিশুপুত্রের কিছু চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। বিবিসিতে সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে একটি প্রোগ্রাম শেষে দেশে ফিরি আরো একমাস পর।

দেশে ফিরে নানা অসুবিধায় পড়ে গেলাম। চারদিকে কেবল ঈর্ষান্বিত মানুষের মুখ। তাই ১৯৭৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। এর আগের বছর ফরাশি সরকার আমাকে 'নাইট ইন দা অর্ডার অফ একাডেমিক ডিস্টিংশান্স' উপাধি ও পদক দিলেন। ১৯৮৯ সালে আমি বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক লাভ করি এবং পরের বছর বাংলা একাডেমিতে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেলাম। এ সময়ে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তাঁর মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ততা নিয়ে অসাধারণ গ্রন্থ–*যখন সময় এল* রচনা করলেন। এতে তিনি ঘনঘন আমার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। বলাবাহুল্য আমি সানন্দে তা দিলাম।

মুক্তিযুদ্ধের মিশনের কথা আমি কখনো বিস্মৃত হইনি, বরং তাকেই জীবনের প্রধান উপকরণরূপে বরণ করেছি। আমার মত সাধারণ মেধার মানুষও কখনোও কিছু যে অসাধারণ কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়েছে সেটা তো সে কারণেই। আমি বিশ্বাস করি, একদা এ দেশের মানুষ বহু বড় সাফল্যের মুখ দেখবে, কেননা

ইতোমধ্যেই অনেক মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটেছে। আমাদের অনেকের বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হবে। শুধু স্বার্থপরতা পরিহার করে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকলেই হবে।

১৯৬৮ সালে প্যারিস ছেড়ে চট্টগ্রামে আসার পর থেকে ঢাকার ফরাশি কনসুলেট এবং ১৯৭২ সালের পর থেকে আজ অবধি দূতাবাস-প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ আমার সঙ্গে অসম্ভব সৌজন্যমূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। রাষ্ট্রদূতদের কেউ কেউ আমাকে 'তাঁদের একজন' এবং 'যথার্থ বন্ধু' মনে করতেন। তবে রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা আমরা দুপক্ষই পরিহার করতাম। অবশ্য মাল্‌রো প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের মিশনের কথা এসে পড়তো। সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়েই চলতো আমাদের আলাপ-আলোচনা। তাঁদের যেমন আমি অনেক কিছু শেখাতে পেরেছি, তাঁদের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছি। ১৯৭৬, ১৯৯২ ও ২০০৫ সালে আমাকে সর্বমোট চারবার উপাধি ও পদক প্রদান করা হয়েছে ফরাশি প্রধান মন্ত্রী, সংস্কৃতি মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে। এসবই ছিলো অপ্রত্যাশিত সম্মাননা। এসবের জন্য আমার ফরাশি জ্ঞান যেমন উপযুক্ত বাহন ছিল, তেমনি ছিল সাধারণভাবে বিশ্ব বা উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কিত বিবিধ আলোচনায় আমাদের একাত্মবোধ।

উপসংহার : পথের শেষ কোথায়?

মুক্তিযুদ্ধের মিশন কি তাহলে শেষ হয়ে গেল? মনে হয় না। চলছে এবং চলবে। উনিশশো একাত্তর সালে মাল্‌রো যখন তাঁর একাত্তর বছর বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে ট্যাংক-যুদ্ধ পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছিলেন তখন অনেকে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। আমিও যদি এখন উত্তর-আশী পর্বে এরকম কথা বলি, তাহলে পরিহাস শুনতে পাবো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তো বন্দুক, কামান বা ট্যাংক নিয়ে যুদ্ধ করবো না। আমি কলম নিয়ে, সম্ভব হলে কম্পিউটারে বসে অথবা কাউকে বসিয়ে, কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে চালাবো মুক্তিযুদ্ধের মিশন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা আমার আপনার পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমি অন্তত কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। আজীবন এই দায়িত্ব পালনে আমি আমার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমার জীবন এখনও অব্যাহত ধারায় চলছে। আমি যথেষ্ট সুস্থ। তবে হ্যাঁ, এই ধারা একসময় অপসৃত হতে পারে। আমি তার জন্যও প্রস্তুত। আমার বাবা-মা, চার ভাই-বোন আর নেই। একান্ত আপনজন ও বন্ধুরা প্রায় সবাই পরপারে। তাহলে কিসের ভরসা? ভরসা শুধু তাঁর উপর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতায়। যিনি আমাকে অপার আনন্দে, অতুল সাহসে ও অফুরন্ত উদ্দীপনায় একটার পর একটা কর্তব্য সমাপনে নিয়োজিত করেছিলেন পরোক্ষে, তাঁর সময়মতো আমাকে তিনি চূড়ান্ত অবসর দেবেন। আমার পথের শেষ কোথায়, তা তখন আমি জানতে না পারলেও অন্যরা ঠিকই জানবেন। তখন তাঁরা আমার সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবেন। কেউ কেউ হয়তো আমার জন্য একটু ভালোবাসার কথাও বলবেন। আর ওটাই আসল কথা: ভালোবাসার কথা। আসুন, আমরা হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করে, সবাইকে ভালোবেসে, স্বদেশকে ভালোবেসে, ক্ষণস্থায়ী জীবনটা অতিবাহিত করে দিই।

১৯৭৭ সালে আমার জীবনের একটা বড় বাঁক পরিবর্তন হলো। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে রাজশাহী চলে গেলাম। কপাল ভালো যে, তখন বাবা ও তাঁর বাল্যবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জাকির হোসেন সাহেব জীবিত ছিলেন না। তাহলে হয়ত আমার পক্ষে চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। জাকির সাহেব স্বয়ং ১৯৬৮ সালে প্যারিসে এসে আমাকে বলেন যে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' সে বছরেই অগস্ট মাসে আমি প্যারিসের অতি দুর্লভ এবং লোভনীয়

চাকরিটি ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে আসি। উভয়েই চেয়েছিলেন, আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হই। কিন্তু তা তো হবার নয়।

পদোন্নতি, কর্মক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন–আমার জন্য, দেশের উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার জন্য সম্ভবত একটা নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা নিয়ে এল। প্রথমত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে আমি নিযুক্ত হলাম প্রফেসর অব কালচারাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল হিস্টরি-পদে। এই প্রতিষ্ঠান এম.ফিল, পি-এইচ.ডি ও স্বকীয় গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানসমৃদ্ধ, মার্কিন ইতিহাসবিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও দেশীয় পণ্ডিতদের আগমনে সরগরম এবং উন্নতমানের সেমিনার-গবেষণায় সতত ব্যস্ত। অল্প দিনের মধ্যে ফরাশি বৃত্তি নিয়ে তিন মাসের জন্য প্যারিসে মাল্‌রো গবেষণা, প্রাগে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের সাথে যোগাযোগ, ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞানী সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং স্ত্রাসবুর্গে এশীয় ফরাশি শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়া–আমার একটা বড় সাফল্য বলতে হবে। পরের বছর বন্ধু আসাফউদদৌলার নেতৃত্বে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পবিত্র দেহভস্ম আনয়নের জন্য পিকিং যাত্রা ও কয়েকশ বৌদ্ধভিক্ষুর সামনে অতীশ সম্পর্কে বক্তৃতাদান আরেক অভিজ্ঞতা বটে। উড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব, বক্তৃতা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ, ১৯৮২ সালে পশ্চিম আফ্রিকার টোগোতে এশীয় ফরাশি শিক্ষক সমিতির সভাপতিরূপে অনুষ্ঠান পরিচালনা, ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সংস্কৃতি কমিশনের কোর কমিটির সদস্যরূপে অন্যতম রিপোর্ট-রচয়িতার দায়িত্ব পালন, ১৯৯০ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের পদ গ্রহণ, ১৯৯১ সালে একমাসের জন্য মার্কিনমুলুক পরিদর্শন উপলক্ষে প্রায় বিশ্বভ্রমণ, ১৯৯২ সালে বক্তৃতাদানের জন্য সস্ত্রীক প্যারিস গমন– ইত্যাকার ঘটনায় পাঠকমণ্ডলীর কাছে আমার কর্মবহুল জীবনের কিছু অংশ ফুটে উঠবে।

আমার অনুরাগীদের কারো মনে হয়তো ক্ষোভ থাকবে যে, বিদেশে প্রচুর পরিমানে পুরস্কৃত হলেও দেশে আমি উপযুক্তভাবে সম্মানিত হইনি। তা ঠিক নয়। ১৯৭৪ সালের হেমন্তে স্পিকার আবদুল মালেক উকিলের অনুরোধক্রমে আমি ঢাকায় গিয়ে জানতে পারি যে, তিনি বঙ্গবন্ধুকে আমার কথা বলে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সম্মত হইনি। কেননা, আমি তখন কূটনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সর্বাগ্রে 'প্রফেসর' হতে চেয়েছিলাম। তাছাড়া, ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার আমাকে একুশে পদক প্রদান করেছিলেন। স্বর্ণপদকটি এখনো আছে। টাকাটা পরের বছর আমার পিত্তথলি অপসারণের কাজে লেগেছে। এই পদক-প্রাপ্তির জন্য সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী (শিক্ষামন্ত্রী) কাজী জাফর আহমদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত এখানে একটি বিদেশী ও একটি দেশী উদাহরণ উপস্থাপন করবো। অনেক সময় অন্তরঙ্গ মহলে আমি বলে থাকি: আমার অনেক উন্নত মানের নৈর্ব্যক্তিক সার্টিফিকেটের চাইতেও– বাংলাদেশ সফর শেষে প্যারিসে ফিরে অঁদ্রে মাল্‌রো আমাকে যে ধন্যবাদ তথা প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন তাকে আমি সর্বোচ্চ স্থানে গণ্য করি।[৩২] সম্প্রতি একটা ঘটনা দেশেও ঘটেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সেরা গ্রন্থ-বিশেষজ্ঞ, আমার বন্ধু ও বড় ভাই ফজলে রাব্বি তাঁর *মেধাহীন মেধা ও আধুনিক শিক্ষা* বইটি না জানিয়ে আমাকে উৎসর্গ করেছেন আর তাতে লেখা : "মুক্তিযোদ্ধা হয়েও যিনি তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় আখের গোছাতে ব্যস্ত হন নি আমার সেই প্রিয় জন ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে।" আমিতো ভেবে পাই না, এর চেয়ে নির্ভেজাল প্রশংসা বাক্য কিংবা শ্রেয়তর উপহার আর কী হতে পারে?[৩৩]

কিন্তু কাজের কাজ খুব বেশি হয়নি। আমার নিজের লেখা উপযুক্ত-সংখ্যক বই-পত্র বের হয়নি। যা ইতিপূর্বে হয়েছিল–ফরাশি বা ইংরেজিতে, তারও অনুবাদ হয় নি। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের মিশন নিয়ে আমার যে চিন্তা-ভাবনা তাও তো অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আমার স্ত্রীর তাগাদা সবসময় ছিল। তাই শেষ অবধি সম্প্রতি আমার ডক্টরেট-গবেষণা পত্রের ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়ে গেল এবং *মুক্তিযুদ্ধের মিশন* বইটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে মুদ্রণযন্ত্রের কবলে চলে যাবার পথে।

মাঝখানে দু'দশক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি শেষে আরো আঠারো বছর সপ্তাহে ছয়দিন সকাল-সন্ধ্যা সাভারে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক - ডীন ও বহুবিধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকেছি। এর মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রতিষ্ঠিত পি.ই.এন-এর নির্বাহী সহ-সভাপতি হয়েছিলাম। তাঁর ইন্তেকালের পর স্বল্পকাল সভাপতির দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়েছিল। তবে ২০০২ সালের শুরু থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম : এত কাল আমি যখন কোন রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করিনি, কোন বুদ্ধিজীবী-বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিইনি, এখন পি.ই.এন বা অন্য কোন সংস্থায়ও থাকব না। কোন প্রতিষ্ঠান যদি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক আলোচনায় আমার অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়, তাহলে তা' করব। কিন্তু রাজনীতি বা দলীয় কিছুতে থাকব না। ফলে আমার পরিচিতি অনেকটা লোপ পেতে শুরু করল। ক্ষতি নেই। আমি তো আছি। আমি আছি-বাংলাদেশের সঙ্গে, বাংলাদেশের মুক্তির মিশনে। প্রয়োজনে আবার দাঁড়িয়ে যাবো। তারপর বসে পড়বো, অন্তত কলম চালাবো। দেখা যাক!

---

[৩২] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

[৩৩] ঢাকা, অন্বেষা গবেষণা কেন্দ্র (মিরপুর), ২০১৩

নির্ঘণ্ট

অ

অলি আহমদ ১৬
অনুপম সেন ২২
অনিরুদ্ধ রায়, ড. ২৭-২৯
অন্নদা শংকর রায় ২৯, ৩৭
অশোকতরু বন্দোপাধ্যায় ৩৩, ৩৯, ৪১
অন্তসত্ত্বা স্ত্রী, ৩০
অমরেশ সেন ৪৪
অমৃত বাজার ৯২
অরুন্ধতি ঘোষ ৯৪
অশ্রুময় ১০২

আ

আনিসুজ্জামান ড. ১১, ২০, ২৪, ২৫, ২৭, ২৯, ৯৫, ৯৬ ১০৫
আবু জাফর মোহাম্মদ ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ২০, ২১, ২২, ৩৩
আনসার শিল্পী ১৫
আবুল ফজল অধ্যাপক ১৪, ১৫
আহমদ ছফা সাহিত্যিক ২৩
আতাউর রহমান খান কায়সার ১৬
আব্দুর রব ২০, ২১
আব্দুল জাব্বার, গায়ক ২৩
আপেল মাহমুদ, গায়ক ২৩
আকবর শাহ কোরেশী কেনু ২৪
আবুল কাসেম, ডাঃ ১৪, ৯১, ১০২
আহমদ পাবলির্শাস ১৮
আমার স্ত্রী ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪
আগরতলা ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮
আমার একাত্তর; ১১
আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার ৩৩
আজিজ ফারুক ৩৫
আব্দুল্লাহ ৩৫
আমজাদুল হক ৩৮, ৯১
আমির খসরু ৪০
আলফ্রেড ভাজ ৪১
আমিন আল হাফেজ ৫৬
'আন-নাহার' ৪৬
আব্দুস সালাম, ব্যারিস্টার ২৮
আবুল মনজুর ২৮
আবুল ফজল, অধ্যাপক ২৮, ১০৫
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ ৩১, ৯৩, ১০৬
আনোয়ারুল করিম জয় ৩২, ৩৭, ৯৪, ৯৭
আনোয়ারা, ডা. খাতুন/বেগম ৩২, ৯৫
আলমগীর কবির ৩৩, ৩৬
'আজাদ' দৈনিক ৪৬
আরব কালচারেল ক্লাব ৫৫
আব্দুল মালেক উকিল ৪১
আওয়ামী লীগ ইনফরমেশন সেন্টার ৫৫
আবু সাঈদ চৌধুরী ৮১
আমিন, ড. ৬১, ৬৮, ৭৩
আলেপ্পো ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬
আবুল আলা আল মারী ৬৫
আবদুস সামাদ আজাদ ৬৬, ৬৭
আফজাল ইকবাল ৬৮
'আল-ইয়োম' ৭২, ৮২
আল ফাতাহ ৭২
আলফ্রেড ৭৪
আলী হোসেন ৭৯
আল আওয়াম ৮০
আবু যোবায়ের, মিশেল ৮২
আল আনোয়ার ৮২
আদুকি, মসিয় ৯৪, ৯৬
আলম ৯২

আরব জগৎ ৯৪
আলী আকসাদ ৯৪
আবু সয়ীদ আইয়ুব ৯৫
আম্বালা ৯৭
আগ্রা ৯৭
আব্দুল্লাহ আল ফারুক ১০০
আলী রেজা ১০২
আরজু ১০৪
আব্দুল জলিল ১০৫
আসাফউদদৌলা ১১০
আব্দুল মালেক উকিল ১১০

ই

ইয়াহিয়া খান ১২, ৬৫, ৭০, ৭২
ইন্দিরা গান্ধী ২৫, ৭০, ৯৭
ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ, ১৯৯২
ইসলামাবাদ ১১
ইন্টারন্যাশনাল স্কলার্স হাউস ২৯
ইন্দ্রানী রায় ২৭, ২৯
ইমপেরিয়াল হোটেল ৪০
ইসকান্দার ৪৭
ইবনে বতুতা ৬৮
ইলমান ১০১
ইন্নাস আলী, ড. ১০৫, ১১২

ঋ

ঋতু রঙ পত্রিকা ২৬

এ

এ.আর. মল্লিক, ড. ১১.১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৪, ৮৩
এম. আর.সিদ্দিকী ১৪, ১৫, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৩, ১০৪
এম.এ. জিন্নাহ ১৯, ২০, ২২
এলবাম ১৪
এভিনিউ, পাম ৩৪
এদুয়ার শাব ৫২
এ.কে.এম. আহসান, সি.এস.পি. ২৪
এলদ, মসিয় ৯৮
এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান ১০০
এনাম চৌধুরী ১০১
এ.কে. খান, শিল্পপতি ৩০, ১০৪, ১০৬

ও

ওসমান জামাল ২৪
ওমর আবু রিশ, ড. ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৪, ৫৮, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮৯
ওয়াফিক তিব্বি ৬৯, ৮৭
ওয়াহিদ মালিক ৭৫, ৭৬
ওবেরতাঁ ৯৮

ক

কামাল খান ডাঃ ১৪
কায়সার ১৬
কালু সওদাগর ১৯
কামরুল হাসান, শিল্পী ২৩
কার্তিক লাহিড়ী, অধ্যাপক ২৩
কে.পি.দত্ত ২৬
কল্যাণী ঘোষ, সংগীত শিল্পী ১৬
কাগমারি ১২
কুমিল্লা ১৭
কাপ্তাই ১৬, ১৯
কুন্ডেশ্বরী মহাবিদ্যালয় ১৮, ১৯, ২০
কাতালগঞ্জ ১৯
কাটির হাট ২০
কর্ণফুলী কাগকল ১৫
কোলকাতা ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬
কুমিল্লা সরকারি কলেজ ২৩
কর্ণেল চৌমুহনী ২৪
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ২৭
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯
কবির উদ্দিন আহমদ ২৮
কফ, ড. ডেভিড ৩১, ৩২, ৩৫

কুতুব উদ্দিন ৪০
কামাল জুমলাত ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ১১২
কারাম, মিলহেম ৫১
কানবাশি, মোহাম্মদ ৫২
কাব্বানী ৫৫
কুয়াৎলি ৫৭, ৬১
কার্লটন হোটেল ৬৬
কাদের, মি. (লেখকের ছদ্ম নাম) ৭৪
ক্লোভিস মকসুদ, ড. ৮০
কবির, ড. ৮৫
কঁসেস, মসিয় ৯৮
কামরুজ্জামান ৯১
কঙ্গো ব্রাজাভিলের প্রতিনিধি ৯৪
কে.জি (কেশন গাঙ্গলী) ৯৫
কবির চৌধুরী ১০২
কক্সবাজার ১০৫
কামরুল হাসান, শিল্পী ১০৫
কাপ্তাই হ্রদ ১০৬
কাজী জাফর আহমেদ ১১০

খ

খালেক ছাত্র ১৫
খালেকুজ্জামান চৌধুরী ক্যাপ্টেন ১৬
খাইরুল্লাহ খাইরুল্লাহ (খায়রুল্লাহ খায়রুল্লাহ) ৫৬, ৭১
খাজুরাও ৪৬
খিয়ামী ৫৮
খোন্দকার মোশতাক ৬৬, ৯২, ৯৩, ৯৪
খোকন (জহির শাহ কোরেশী) ১০২, ১০৪
খালেদা হানুম ১০৫

গ

গৌহাটি ২৫
গ্র্যান্ড হোটেল ২৩
গড়িয়া হাট ২৭
গোপাল দাশ, শ্রী ২৯
গৌতম দা ৩২
গৌর মজুমদার ৩২, ৯৫
গৃহ সাহেব ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৬৫
গনি, ডা. ৯৫, ৯৬
গণ ভবন ১০২

ঘ

ঘোষ, মি.এস.এম ৪১

চ

চট্টগ্রাম ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২৬, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১১, ১২, ২০, ৬২, ৯৫
চট্টগ্রাম কলেজ ১৪, ১৬, ১০০
চম্পা খালা ২৩, ১০১
চৌহদ্দি ২২
চেঙ্গিস খাঁ ৭০
চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট ৯১
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ৯১
চক্রবর্তী, ড. জে ৯১
চিটাগাং আর্ট গ্যালারী ১০৬

জ

জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৩
জামাল খান রোড ১৩
জাফর মামা ডা:১৩
জিয়া উদ্দিন, ড. ১৭
জর্মন স্ত্রী ১৯
জহির উদ্দীন খান ২৬, ১০৪
জহুর আহমেদ চৌধুরী ২৬
জহির রায়হান ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৬, ১০৪
জালাল উদ্দীন আহমদ, মোল্লা (আমরা দুজন, মোল্লা জালাল, জালাল ভাই, মি. আহমেদ.....) ৩৭, ৪১, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭-৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৭, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০৬

জয় প্রকাশ নারায়ন ৩৮
জাহানারা ৪০
জে, জে সিং ৪২
জঁ ক্লোদ এলালুফ ৪২, ৪৪
জোরায়েক, প্রফেসর ৫৬
জন স্টোন হাউজ ৩৬
জিয়াদ, ড. ৬৯
জোয়াদ বুলুজ ৭৬
জেরার ভিরাতেল ৯১, ৯৫
জগজীবন রাম ৯৮
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ১০২
জিয়া হায়দার ১০৩
জয়নুল আবেদীন, শিল্পী ১০৫, ১০৬
জাকির হোসেন (সাবেক গর্ভনর) ১০৯

ট

টিক্কা খান ১৫

ড

ডি.আই.টি এভিনিউ ৯২
ডেভিড ফ্রস্ট ১০১

ঢ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২, ২৩, ২৪, ১০২
ঢাকা ১২, ১৩, ২৩, ৯১, ১০১, ১০৪, ১০৬

ত

তাহের সোবহান ১৪
তাজুল শিল্পী ১৫
তেজেন সেন, সংগীত শিল্পী ১৬
তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ২৪
ত্রিগুণা সেন ২৫
তরুন মিত্র ৩২
তাজ উদ্দীন, প্রধানমন্ত্রী ৩৩, ৯৪
তৌফিক তিব্বি ৪৬
তোফায়েল আহমদ ৩২
তাকিয়েদ্দীন সোল ৭৬, ৮২, ৮৬, ৮৮, ৮৯
তলেদো ১০৭৪
তেজগাঁও বিমান বন্দর ১০১

দ

দেবদাস চক্রবর্তী, শিল্পী ১৫
'দেনিক কালের কণ্ঠ' ১৩
'দেনিক দিনকাল' ১৯
'দেনিক প্রথম আলো' ৩১
'দেনিক বাংলা' ১০১, ১০২
দৈনিক 'মোঁদ' ৩৪
দত্ত বাবু ২৫, ৪১
দিলীপ মালাকার, ড. ৩২, ৪১, ৯৪, ৯৭, ১০১
দেবব্রত বিশ্বাস ৩৩
দেবদাস চক্রবর্তী ৩৪, ১০৬
দাশ গুপ্ত ৪১
দার, শ্রী এ.কে (ভারতীয় রাষ্ট্রদূত) ৪৬, ৬৯, ৭১, ৭৩ ৯৯
দুশন জভাবিতেল ৩৯
দামেশ্ক ৫৭, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৯, ৭০
দিল্লী ১০১
দুলহীন মামী ১০১, ১০৩

ধ

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ৩৪

ন

নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাউজ ১৫
নাজিরহাট কলেজ ১৮
নূতন সিংহ ১৮, ২০
নীলক্ষেত ২৩
নরসিংগড় ২৩, ২৪, ২৫, ২৬
নন্দিনী শতপথী ২৫
নুরুল কাদের খান ২৭
নাজমা ২৯

নাসরিন (সৈয়দা কমর জাবীন) ২৯, ৩৬, ৩৭, ৫৫, ৮৩, ৯২, ৯৬
নরেশ গুহ, ড. ৩০
নীরদ চৌধুরী ৩৯
নিজাম উদ্দিন আউলিয়া ৪০
নন্দ, মি. ৪৫, ৫৫
নিকোলাস যিয়াদে, প্রফেসর ৫৫, ৫৬
নাসের, প্রেসিডেন্ট ৪৮
নকশাল ৩০
নাবিল বারাদি ৬৯, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৭, ৯০
নাথালি সারোত ৮১
নাইট ইন দা অর্ডার অফ একাডেমীক ডিসটিংসাংস্ ১০৭
ন্যাশনাল ব্রোকার্স ১০৪
নাবিল শাহ কোরেশী (পূষণ) ৯৭, ১০৫

প
পাকিস্তান ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২১
প্রণোদিৎ কুমার বড়ুয়া, সংগীত শিল্পী ১৬
প্রফুল্ল সিংহ ১৯, ২০
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ২৩, ২৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম ২৪
পলিটেকনিক হোস্টেল২৫
প্যারিস ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৭৩, ৯১, ৯৩, ১০৩, ১০৭
পাবনা ২৭
প্রতিভা বসু ৩১
পিটার হেজেল হার্স্ট ৩৩
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়৬৭
পোঁপিদু, প্রেসিডেন্ট ৭২
পালাম বিমান বন্দর ৯১
পৃতিশ নন্দী, কবি ৯৫, ১০২
পি.ডাব্লিউ.ডি ১০৪

ফ
ফনী বড়ুয়া, কবিয়াল ১৫
ফ্রান্স ১২, ২৪
ফরাশি ১২
ফিরু ভাই (ড. মল্লিকের বড় ছেলে) ১৭, ২২
ফরহাদ (ডা: জাফরের শ্যালক) ২০
ফিলিবের, অধ্যাপক জিল ২৪, ২৮, ৩৯, ৯৩
ফরাশি কন্সাল জেনারেল, কোলকাতা, মসিয় বের্নার ৩১, ৯৬
ফরাশি কন্সাল জেনারেল, আলেপ্পো, লুই সেকুতোভিচ
৬১-৬৪, ৬৬, ৬৮
ফারুক আজিজ খান ৩৩
ফিরোজ খান নুন ৪৭
ফকির শাহবুদ্দিন ৪৪
ফ্রাঁস ভট্টাচার্য, মাদাম ৪০
ফারিস ৮৭
ফরাশি রাষ্ট্রপতি ১০৮
ফরাশি প্রধানমন্ত্রী ১০৮
ফরাশি সংস্কৃতি মন্ত্রী ১০৮
ফ্রঁসোরা দরে ৯১
ফরাশি দূতাবাস ৯১
ফজলে হাসান আবেদ ৯৪
ফ্রেন্স টেলিভিশন ৯৮
ফজলে রাব্বী ১০২, ১১১
ফি গ্যারো, ল ফরাশি দৈনিক

ব
'বাংলায় বিদ্রোহ'
বজল মামা ১৮
বুলবুল (ছোট বোন) ১৯
বদরম্নল হাসান, বন্ধু ২৩, ২৪
বাংলাদেশ মিশন ২৬, ৯২
বাংলাদেশ ২৫

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১২, ৫৯, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৬৯ ৯৯, ১০২, ১০৬, ১১২
বড়ুয়া বাবুর্চি ১২
বেলায়েত হোসেন, ড. ২৮
বুখারেশত ৩১
বাবুল চৌধুরী ৩৩
বিজন ভট্টাচার্য ৩৩, ৩৪
বুফোঁদো ৩৮, ৪৩
বিজয় লক্ষী, পন্ডিত ৪৬
বাংলাদেশের আরব বন্ধু সমিতি ৫৬
বুদ্ধদেব বসু ৩০
বৈরুত ৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৭, ৮৩, ৮৯, ৯২, ৯৪ ৯৯, ১০৬
বাহিজ আরবাশ ৫৮
বেজবুজ ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৬
বাতোলীয়ে রিয়াদ আবেদ ৫৯, ৬০, ৬১
ব্যারন হোটেল ৬২
বোয়া, পিয়ের ৭০
বিশরা ঘোরয়েব ৭৪
বাদশাহ ফয়সাল ৮৬, ৮৮
বিড়লার গৌতম ৯৪
বন্দোপাধ্যায়, মিসস ৯৭
বেনাপোল ৯৮
বিবিসি ১০০
বেলাল মোহাম্মদ ১০০
বাবলু মামা ১০১, ১০৩
বুলবন ১০১
বাটালি হিল টপ ১০৪
বাংলা একাডেমীতে মহাপরিচালক ১০৭
বর্দো ১০৭

ভ
ভূঁইয়া ৩৩
ভরদ্বাজ ৫৭, ৬৬
ভূট্টো ৯৯
ভেরিয়ের ল্য বুইসসোঁ ১০৭

ম
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী ১২, ৬২, ৬৮
মার্চ একাত্তর:১৩
মাহবুব হাসান ১৪
মযহারম্নল ইসলাম ড. ১২, ১৩, ১৪
মমতাজ উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ১৪, ১৫
মিজানুর রহিম, শিল্পী ১৫
মাহবুব হাসন ১৫
মেসবাহ উদ্দিন আহমদ, ড. ১৬
মুজিবনগর ১৪, ১৬
মাইজ ভান্ডার ১৭
মাসুদ মিয়া (প্রকৌশলী বড় জামাই) ১৬, ৩৬
মেহরাব, (শ্যালক, সৈয়দ আলী কাজেম) ১৮, ২৩, ২৫, ২৬, ৩৬, ১০০
মহিউদ্দিন ১৮
মাহফুজল হক শেরে বাংলার মন্ত্রী ১৯
মরিয়ম নগর ১৯
মা-মনি ২৩
মাহবুল আলম চাষী ২৩, ৯২
মিজোরাম ২৪
মাদাম গান্ধী ২৫
মউদুদ আহমদ, ব্যরিস্টার ২৬, ২৮, ২৯, ৪৩, ৯২, ৯৮
মেজর জিয়া ৩৩
মৈত্রেয়ী দেবী ২৭
মাহবুব তালুকদার ৩৩, ৩৭
মতিলাল ৩৫
মনোজ বসু ৩৬
মাসুদ ভাই ৩৬
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৪০
মমিন তালুকদার ৪১
মজুমদার, সুবোধ ৪১

মকসুদ ক্রুভিস ৪৭
মোহাম্মদ মোস্তফা ৪৭
মুখতারা ৪৮
মাহমুদ কাছিম ৮০
মাল্‌রো, অঁদ্রে ৬৩, ৮০, ৮১, ৮৩, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২
মুস্তাফা আমিন, ড. ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৬
মিশেল আরবাশ ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১
মাদানী খিয়ামী, ড. ৫৮
মোরো, লইক ৬৩
মারুফ সাদ ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮২
মোহায়ের পত্রিকা ৭৪
মহেন্দ্র মশায় ৭৭-৮০
মাহমুদ তুব্বু ৭৭, ৭৮, ৮২
মোতাহার ৮৫
মারিয়ান ৫৩
মোঃ শামসুল কাদের (লেখকের ছদ্ম নাম) ৭৪
মিসেস ইসলাম (সৈয়দ নজরুল ইসলাম) ৯৪
মোহাম্মদপুর ৯৯
মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক ৯৯
মুক্তি ফোজ ৯৯
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ৯৯
মুজিব নগর ১০১
মোঃ মনিরুজ্জামান, কবি ১০৩
মিসেস মুনীর চৌধুরী ১০৩
মিরপুর ১০৩, ১০৪
মুসলিম ইনস্টিটিউট ১০৫
মোঃ আলী, অধ্যাপক ১০৫
মিজানুর রহীম ১০৬

য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৭, ৩০, ৯১

র

রেয়াজউদ্দিন বাজার ১৩
রোকসানা আহমেদ ১৫
রশীদ চৌধুরী, শিল্পী ১৫, ৩৪, ১০৫, ১০৬
রাই গোপাল, কবিয়াল ১৫
রফিক, ই.পি.আর, ক্যাপ্টেন ১৬, ২০
রাজিয়া শহীদ, সংগীত শিল্পী ১৬
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১২, ৬৩
রাজশাহী ১২, ১০৪, ১০৭
রাঙ্গুনীয়া কলেজ ১৬, ১৮
রাঙ্গামাটি ১৭, ১৮
রাঙ্গুনীয়া ১৮, ২৪
রামগড় ১৯, ২০, ২২
রাউজান ১৯
রশিদুল হক ড. (গণিতবিদ) ২২, ২৪
রু কান্তারি, ভারতীয় দূতাবাস ৫৬
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার ২৮, ৯৫
রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট ৩১, ৩২, ৩৪
রহিম বাবুর্চি ৩২
রেস্তোরাঁ, ট্রিনকাস ৩৪
রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ৩৬
রেহমান সোবহান, ড. ৩৯
রবীন্দ্র দাশগুপ্ত ৪০
রাখী চক্রবর্তী ৩৩
রবার্ট হান্না ৭৮, ৮০, ৮৬, ৮৮
রোকেয়ার কবর ৫৮
রসুল নিজাম ৬১, ৬৩, ১০৩
রোটারি ক্লাব ৬৩
রুহুলমান, প্রফেসর ৬৩
রাফিক মারুশ রেস্তোরাঁ ৭১
রাই, মি. ৭৪
রশীদ কারামে ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৯
রফিকুল্লাহ চৌধুরী ১০২
রবীন্দ্রনাথ ৯৫
রীনা নন্দী ৯৫
রফিক (প্রথম সচিব) ১০১

রেসকোর্স সভা ১০১
রাশেদা জামান ১০৩

ল

লুই রনু, অধ্যাপক ২৮
লীলা রায় ২৯, ৩৭
লোকনাথ ভট্টাচার্য, ড. ৪০, ৯৫
'ল অরিয়ঁ লজুর' ৪৬, ৮০
লেবানিজ একাডেমী ৪৭
লাতাকিয়া ৫৮
লন্ডন ৫৯
লুই আল হাজ্জ ৭০
লুই দুমোঁ, প্রফেসর ৭৫
'লব সের ভাত্যর' ৯৮
লিলি ওরফে হোসনে আরা ১০৩
লাল খাঁ বাজার ১০৪

শ

শেখ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধু, মুজিব আবদেল রহমান) ১৪, ১৫, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৬, ৭৪, ৭৬, ৮০, ৮৪, ৮৬
শামসুল আলম মামা, গ্রন্থাগারিক ১৬
শমসের মবিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট ১৬
শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব, সংগীত শিল্পী ১৬
শেফালী ঘোষ, সংগীত শিল্পী ১৬
শামীম মামা ২৩
শামসুল হক, ড. (পদার্থবিদ) ২৪
শামসুদ্দিন আবুল কালাম ৩০
শাজেল শাহ কোরেশী ৩২
শেহাব উদ্দীন, কে.এম ৩৭, ৩৮, ৪৪, ৭৯, ৮০, ৯১
শফিকুল মান্নান খান ৩৮
শেখ আব্দুল্লাহ আলায়লী ৭৫, ৭৬
শামসুল আলম, মিসেস ৭৯
শেক্সপীয়ার ৯১
শেরে বাংলা (এ.কে. ফজলুল হক) ৯৫
শামসুর রাহমান, কবি ১০১

স

সফিনা হোটেল ১৩
সৈয়দ মুহম্মদ শফি ১৪
স্যার এ.এফ. রহমান ১৭
স্বাধীন বাংলা ১৫, ২০
সন্তোষ বাবু অধ্যক্ষ ১৮
সুবিদ আলী ভূইয়াঁ ক্যাপ্টেন ১৮
সিমাব (শ্যালক, সৈয়দ আলীউল আমিন) ২২, ৯৬, ১০১
সুবা ভাই, চা বাগানের ম্যানেজার ২০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২২, ২৭, ৩১
সত্যেন সেন, সাহিত্যিক ২৩
সার্কিট হাউস ২৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ২৪, ৩৯
সিদ্ধার্থ শংকর রায় ২৫
সুকুমারী ভট্টাচার্য, ড. ২৭
সুতনুকা ২৭
সুশোভন সরকার ২৭
সুমিত সরকার ৩৭
সরোয়ার মুর্শিদ খান, ড. ২৭
সুবিদ আলী এম.এল.এ ২৮
সুনীল দাস, শিল্পী ৩১, ৩৪
সাদেক খান ৩৩, ৩৪, ৩৫
সানজিদা খাতুন, অধ্যাপিকা ৩৩
সুচিত্রা মিত্র ৩৩
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ৩৮
সোয়েল, মি. ৩৮
সার্ত্র, জঁ পল ৩৯
সিমন দ্য বোভোয়ার ৩৯
সুভাষ চক্রবর্তী ৩৯
সেন (স্বয়ং লেখক) ৪১
সোহরাওয়ার্দী ৪৭

সোয়াত ৫৭
সৈয়দ আলী আহসান
১১,১২,১৭,১৮,২১,২২,২৩,২৪,২৫,৫
৭, ৮৩, ১০২, ১০৭, ১১১
সালাদিনের কবর ৫৮
সালিবা ৫৯, ৬০, ৬১
সালাম হিদার ৬০
সুক হামিদিয়া ৫৮
সারওয়ার জাহান ডলি (মিসেস রসুল নিজাম) ৬৩, ৭৯
সিটাডেল দুর্গ ৬৪
সৈয়দ আব্দুস সুলতান ৬৪
সেন্ট জর্জ হোটেল ৬৮
সাইদা ৭৩
সাহনি ৭৯
সাইয়েদুল হক ৭৯
সামির আতাউল্লাহ ৮১
সফি দ্য ভিলমোরা ১০৭
সুইন হো স্ট্রীট ৯১
সেন কনক, ড. ৯৯
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৯৪
সালমা চৌধুরী (ড. আনিসুজ্জামানের ফুফু) ৯৫
সুনীল দাস, শিল্পী ৯৫
সমীর ঘোষ ৯৫
সৈয়দ মুজতবা আলী ৯৫
সুমন বন্দোপাধ্যায় ৯৭
স্টেট ব্যাংক ৯৯
সৈয়দ শামসুল হক ১০৭
সঞ্জু ১০১
সৈয়দ বদিউল আলম ১০৩
সদর ঘাট ১০৩
সবিহ উল আলম ১০৬
সামির আতাউল্লাহ ১১২

হ

হুমায়ণ আব্দুল হাই ড. ১৬
হরি প্রসন্ন পাল শিল্পী ১৬
হোটেল জনপদ ৪৪
হাসনায়েন হায়কেল ৪৭
হুমায়ুন কবির ৫১, ৫২
হিতাফ. ডা. আবদেল সামাদ ৫২, ৬৮, ৬৯
হায়দার বোজো ৫৮
হাকিম আদনান ৬১, ৮৬
হামাস ৬২
হাফেজ, ড. আমিন ৬৮, ৬৯
হুমায়ুন খান ৮১
হামা ৯০
হোসেন আলী (বাংলাদেশ মিশন প্রধান, কোলকাতা) ৯২, ৯৩
হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ ১০২

W.C. Smith 97
Angier Biddle Duke, Ambassador 34
Morton Hamborg 34
Lee Thaw, Mrs. 34
Daniel L. Bladner, Dr. 35
Thomas W. Philips 35

মাহমুদ শাহ কোরেশী-র জন্ম ১৯৩৬ সালে, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়ায়। পাহাড় নদী হ্রদ আর গাঢ় সবুজ গাছপালায় ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশেই তাঁর প্রথম জীবনের স্বপ্ন ও আনন্দময় দিনগুলো কেটেছে। কলেজের লেখাপড়া চট্টগ্রামে। অতঃপর ছাত্র হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বাংলায় সম্মান ও এম. এ. ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এবং তার পর-পরেই পাড়ি জমিয়েছেন প্যারিসে, ফরাশি সরকারের বৃত্তি নিয়ে। ১৯৬৫ সালে সর্বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সম্মানের সঙ্গে পেয়েছেন ডক্টরেট ডিগ্রি। ১৯৬৮ সালে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৭১ সালে যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭৬ সালে কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে। '৮০-র দশকের শেষ-পাদে যোগ দিয়েছিলেন বাংলা একাডেমীতে, মহাপরিচালক পদে। ১৯৯৮ সালে পাকাপাকিভাবে ফিরে এসেছেন ঢাকায়। যোগ দিয়েছেন সাভারস্থ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলো কাটছে সেখানেই।

প্যারিসের দিনগুলোতে ফরাশি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। জাক প্রেভের-এর কবিতার সঙ্গে পরিচয় সেই সূত্রেই। আজো প্রেভের তাঁকে প্রথম পাঠের উন্মাদনার মতোই আলোড়িত ও উদ্দীপিত করে।

কবিতার প্রতি আসক্তি এবং কবিতা অনুবাদের এষণা মাহমুদ শাহ কোরেশীকে বারবার কবিতার কাছে টেনে নিয়ে এলেও মননশীল ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনাতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন বেশি। ইউনেস্কো তাঁর বাউল গানের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ Etude sur L'evoulution intellectuelle chez les Musulmans du Bengale 1857-1947. ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'Culture and Development, 'দার্শনিক দিদরো ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি', 'মাহবুব-উল আলম', 'অদ্রে মালরো শতাব্দীর কিংবদন্তী', 'Crescent and Lotus : A Study on the Intellectual History of the Muslims of Bengal (up to 1947)'.